Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা এবং আমাদের করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তরফদার মনিতাজ রাকা

রোলঃ 227021740

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা এবং আমাদের করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তরফদার মনিতাজ রাকা

রোলঃ 227021740

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা এবং আমাদের করনীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তরফদার মনিতাজ রাকা, আইডিঃ 227021740 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিমদের অপতৎপরতা এবং আমাদের করনীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মনিতাজ রাকা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তরফদার মনিতাজ রাকা

আইডিঃ 227021740

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অমুসলিম কারা?

"অমুসলিম" বলতে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয় যারা ইসলামের অনুসারী নন বা মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেননি। এই শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম এবং বিশ্বাসের মানুষ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ:

- হিন্দু - যারা হিন্দু ধর্ম পালন করেন।
- বৌদ্ধ - যারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী।
- খ্রিস্টান - যারা খ্রিস্টধর্ম পালন করেন।
- ইহুদি - যারা ইহুদি ধর্মের অনুসারী।
- শিখ - যারা শিখ ধর্ম পালন করেন।
- নাস্তিক - যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না।

অমুসলিমদের অপতৎপরতা

সারাবিশ্ব জুড়ে মুসলিমদের উপর অমুসলিমদের অপতৎপরতা বিরাজমান। তারা বিভিন্ন ভাবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর প্রধানত নির্যাতন চালায়। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে ধর্মান্তরিত করে তাদের ধর্মে দীক্ষা দেওয়ানো। তারা সারা পৃথিবীতে মিশন চালায় মিশনারি হয়ে।তবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন জিঘাংসাও এর জন্য দায়ী।

খ্রিস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা

পূর্ব পরিকল্পনা

১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিন নামক স্থানে সমকালীন খৃষ্টবাদ প্রচারের ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। তাতে সারা দুনিয়ার প্রায় দেড়শ প্রথম সারির খৃষ্টান ধর্মগুরু ও ধর্মনেতাগণ যোগদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন দেশের বড় বড় গির্জা, মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গবেষণা এবং বোধ ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে খৃষ্টবাদ প্রচারের স্বার্থে এ ব্যাপারে অত্যধিক

গুরুত্বারোপ করেন যে, দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদেরকে খৃষ্টবাদের বিষাক্ত ট্যাবলেট গলধকরণ করানো নাও যায় তাহলে সমস্যা নেই; কিন্তু কমপক্ষে অতি অবশ্যই মুসলমানদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলন ঘটানো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পঙ্গু করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। কনফারেন্সে যোগদানকারী ধর্মনেতাগণ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। যা পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ উগ্র ও চরমপন্থী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে।তারা সেই উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে ভালো মানুষের মুখোশের আড়ালে ধর্ম প্রচার করে মানুষকে তাদের ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ধর্মান্তরিত করা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে মিশনারির আগমন

মিশনারি হলো খৃষ্টানদের দাওয়াতি সংস্থা। সারা দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ প্রচারকের মাধ্যমে খৃষ্টানরা খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে আসছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আজ থেকে পাঁচশ বা ছয়শ বছর আগে খৃষ্টান মিশনারিরা এই বাংলায় আসে। পর্তুগিজরা যখন বাংলায় বা ভারতে আসে তখন সাথে করে খৃষ্টান মিশনারিদেরও নিয়ে আসে। জেসুইস ও অগস্টেইনিয়া নামক ক্যাথলিক খৃষ্টানদের দুটো দল পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় ২০০ বছর যাবত বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করে আসছে। মোঘল সম্রাট আকবর ভারতের বাঙাল প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিলে তাদের ছত্রছায়ায় মিশনারিরা এসে এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছিল, স্কুল বানিয়েছিল, হাসপাতাল চালু করেছিল। হুগলিকে কেন্দ্র করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে তারা ঢাকাতেও নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছিল।

এভাবে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে এতদাঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারি তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি বিনা খাজনায় (লা-খেরাজ) খৃষ্টান মিশনারিদের দান করলেন। ফলে তারা আরো বেশী উৎসাহিত হয়।

অসহায়, নিরক্ষর মানুষকে সেবা দেওয়ার নামে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে যে সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চালাচ্ছে তার মধ্যে কিছু হলো –

(১) কারিতাস, (২) এন.সি.সি. (ননলাইট সেন্ট্রাল কমিটি), (৩) লুথারান মিশন, (৪) দ্বীপশিখা, (৫) সালভেশন আর্মি, (৬) ওয়ার্ল্ড ভিশন, (৭) সি.ডি.এস. (সেন্ট্রাল ফর ডেভেলপম্যান্ট সার্ভিস), (৮) আর.ডি.আর.এস. (রংপুর দিনাজপুর রোড এন্ড সার্কেল), (৯) সি.সি.ডি.ভি. (খৃষ্টান কমিশন অফ ডেভেলপম্যান্ট), (১০) হিড বাংলাদেশ, (১১) সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট, (১২) চার্চ অফ বাংলাদেশ, (১৩) পের ইন্টারন্যাশনাল, (১৪) সুইডিশ ফ্রেমিশন, (১৫) কনসার্ন, (১৬) এডরা,

(১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট সোসাইটি, (১৮) এমসিনি, (১৯) ওয়াই.ডব্লিউ.সি. (২০) ফেমিলিজ ফর চিলড্রেন, (২১) আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট ইত্যাদি।

এসব সংস্থা বাজেটের ৯০ ভাগ খৃষ্টানদের অথবা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনায়ময় ব্যক্তিদের পিছনে ব্যয় করে থাকে।

এনজিওদের কার্যক্রম

চার্চ অফ বাংলাদেশ

ডঃ জিগা বি. আলসেনের পরিচালনায় "চার্চ অফ বাংলাদেশ" নামে একটি খৃষ্টান মিশনারি এনজিও ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে "মেমোরিয়াল হসপিটাল" নামে একটি খৃষ্টান হাসপাতাল তৈরি করে। এলাকার লোকজন ছিল অভাবগ্রস্ত ও নিরক্ষর। এই সুযোগে ড. জিগা বি আলসেন তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে সেবাদানের মাধ্যমে ৩৮ বছর এই মালুমঘাটের চকরিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে মালুমঘাটে যেখানে একজনও খৃষ্টান ছিল না, তার প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে সেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। তারা আশেপাশের জমি ক্রয় করে নয়া খৃষ্টানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়াম আশ্রমের পাশে তারা বিশাল খৃষ্টান এলাকা গড়ে তুলেছে। সেখানে দুর্গম এলাকায় পাহাড়ের ভিতরে তারা গির্জা নির্মাণ করেছে।

সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট

এই "সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট" খৃষ্টান মিশনারি তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে ৮৫ টি প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা করে। এসব স্কুলে কোন মুসলমানের সন্তান ভর্তি নেওয়া হয় না। ১৯৯০-৯১ সনে এই "সেভেন ডে চার্চ" ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করে বহু মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে।

হিড বাংলাদেশ

"হিড বাংলাদেশ" নামে এ এনজিও মৌলভী বাজারে, কমলগঞ্জে, সুন্দরবনে সেবার আড়ালে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। সূচনাতেই তারা ৬ লক্ষ মার্কিন ডলার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

সি. সি. ডি. ভি.

"সি. সি. ডি. ভি." নামক সংস্থা রংপুর, দিনাজপুরসহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কাজ করছে। আর "ডি.আর. আর. এস." এর সমস্ত সংগঠন টাকা নেয় সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড থেকে। মিস্টার টরবেন পিটারসের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালে ২১৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে সাঁওতাল উপজাতিদেরকে দাওয়াত দিয়ে ৩৫ হাজার সাঁওতালকে তারা খৃষ্টান বানিয়েছে।

পাহাড়িদের বিভিন্ন উপজাতি

এগুর্ণা, চাকমা, মারমা, তনচৈঙ্গা, চাক, ক্ষুমি, ভৌম, ত্রিপুরা, খাশিয়া, মনিপুরী, খিয়াং, মাংখু, লুশাই, মগ, গারো, মুরু, সাঁওতাল, রাখাইন, হাজং, রাজবংশী, মুরং, কুকি, হুদি, পাংখো, উড়াও, বোনজোগী, দালই, লুসাই, খুশী, তংচংগা, বংশাই, বোম, মুনী চাক, চোক, হরিজন, মুন্ডা ইত্যাদি – এগুলো আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠী। এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। বৈবাহিক ক্ষেত্রে তারা বংশীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু "পাঙন" সম্প্রদায় ছাড়া অন্য উপজাতির অধিকাংশ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আবার ১০.৫% হিন্দু জনসংখ্যার বিপুল পরিমাণ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

প্রচার ও প্রচারণার অপকৌশল

মুসলিম বিশ্বে খ্রিস্টান মিশনারী গোষ্ঠী প্রেরণ এবং খ্রিস্টবাদের দিকে আহ্বান জানানো: এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা নিম্নোক্ত কর্মসূচীসমূহ গ্রহণ করেছে:

বই প্রচার ও পত্রাদি বিলি

উল্লিখিত আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে জানা যায়, খৃষ্টধর্ম বিষয়ক ১ লাখ ৯ হাজার ৯ শত ধরনের বই ও একত্রিশ হাজার তিনশত রকম ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। মুসলিম বিশ্বে বিনামূল্যে বিলিকৃত বাইবেলের সংখ্যা প্রায় ৬৩ কোটি ৯ লক্ষ ৪০ হাজার এবং মুসলমানদের জন্য ইসলামী পরিভাষায় রচিত বাইবেল অর্থাৎ "কিতাবুল মুকাদ্দাস" আঠারো কোটি তিরাশি লক্ষ তিরিশ হাজার। সর্বোপরি খৃষ্টবাদ, ইউরোপীয় ধর্মদর্শ ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে চলেছে। ১৬ ই এপ্রিল ১৯৯৮ ইং সনে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এডওয়ার্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ বছরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজার রকম বই প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ভিডিও, অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা এবং "স্বর্গমত ম্যাগাজিন" উল্লেখযোগ্য।

ধর্মগ্রন্থ ও সংস্থার নাম পরিবর্তন

মিশনারিরা মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সারা বিশ্বে বাইবেল নামেই বহুল পরিচিত। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে নাম পরিবর্তন করার কৌশলে খৃষ্টান মিশনারিদের জুড়ি নেই। সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় খৃষ্টানরা বাইবেলকে "ধর্ম পুস্তক" নামে ১৯৬৩ সালে "পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি" থেকে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে একই সংস্থা "বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি" (বি. বি. এস.) তাদের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে "পবিত্র বাইবেল" নামে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, উভয় নামের বাইবেলে (তথাঃ ধর্ম পুস্তক – ১. "বাংলাদেশ বাইবেল", ২. "পবিত্র বাইবেল"; মৌলিকভাবে দুটো অংশ রয়েছে – ১. "নতুন নিয়ম",

২. “পুরাতন নিয়ম”) পরবর্তীতে সংস্থার নাম পাল্টিয়ে “মসীহী জামাত” নামকরণ করে তাদের পবিত্র বাইবেলকে “কিতাবুল মুকাদ্দাস” নামে প্রকাশ করে। এই কিতাবুল মুকাদ্দাসে “পুরাতন নিয়ম” অংশের নামকরণ করেছে “তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাব” এবং “নতুন নিয়ম” অংশের নামকরণ করেছে “ইঞ্জিল শরীফ”। প্রমাণ্য ঐতিহাসিক সত্য হলো, ওসব নামের তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ’র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অবিকৃত কিতাব নয়।

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল

খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের “কিতাবুল মুকাদ্দাস” ও “ইঞ্জিল শরীফ” এর মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনালী রঙের ইসলামী ধাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা পবিত্র হাদিসগ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।তারা এখন তাদের যাবতীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পত্রাদির প্রচ্ছদ, মসজিদ, কালেমা, আরবি বর্ণের শৈল্পিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করছে। এমনকি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যেমন পর্দা, নামায, নারী শিক্ষা, ওযু ইত্তাদিকে বিকৃত উপস্থাপনে ও বক্তব্যে সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করে চলেছে।

ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার

খৃষ্টান মিশনারিরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামী পরিভাষা, শব্দ ও নামাবলী চুরি করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও বইগুলো প্রকাশ করে চলেছে। তাদের পবিত্র বাইবেলের কিছু শব্দ উল্লেখ করা হলো, যে শব্দগুলোকে তারা তাদের গ্রন্থ কিতাবুল মুকাদ্দাসে ইসলামী পরিভাষা ও নামের রূপ দিয়েছে (কিতাবুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তিত রূপ ব্র্যাকেটে উল্লেখ করা হলো) –

আদিপুস্তক (আল-তৌরাত), প্রথম সিপারা (পয়দায়েশ), পরমগীত (নবীদের কিতাব সোলায়মান), গীতসংহিতা (আল জবুরঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সিপারা), ঈশ্বর (আল্লাহ), ঈশ্বর পুত্র (ইবনুল্লাহ), পরিত্রাণ (নাজাত), ভাববাদী (নবী), ভজনা (এবাদত), বিশ্বাস (ঈমান), ব্যবস্থা (শরীয়ত), আব্রাহাম (ইব্রাহীম), মোশি (মুসা), দায়ুদ (দাউদ), যীশুখৃষ্ট (ঈসা মসীহ), দূত (ফেরেশতা), শির্ষ (সাহাবী), প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা), উবড় (সিজদা), যাচঞা (মুনাজাত), অলৌকিক কার্য (মোযেজা) ইত্যাদি।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি

সর্বোপরি তাদের নির্লজ্জ ও জঘন্যতম জালিয়াতির দৃষ্টান্ত হলো দীর্ঘ ১৬ বছর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত চুরি করে প্রতিটি অধ্যায়ে আরবিতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" দিয়ে শুরু করে তাদের কথিত ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের কোন কিছু শুরু করা হয় "পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা" এর নামে। বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মের নামে এতো বড় জালিয়াতির নজির আর নেই।

পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা

ইদানিং তাদের ঘৃণ্য প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী চরমে পৌঁছেছে। তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আংশিক প্রয়োগ এবং নিজেদের মনগড়া বানোয়াট অনুবাদ ও বাইবেলের স্বপক্ষে অপব্যাখ্যা দিয়ে নানা রকম পুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার করছে। যেমন ত্রিত্ববাদের মাঝে আল্লাহ এক, ইঞ্জিল ও কুরআনে ঈসা কালিমাতুল্লাহ'র ব্যক্তিসত্তা রক্তমাংসের দেহে আবৃত, আমরা কিভাবে সালাত কায়েম করি। তারা এখন তাদের বইয়ে সরাসরি কুরআনের আরবি আয়াত সংযোজন করছে। মুসলমানরা কুরআনের আয়াতকে সম্মান করে বলে তাদের ঘরে মিশনারিদের রচিত বই-পুস্তক স্থান পায়। কালার সমৃদ্ধ তাদের এ বইগুলো পড়ে সরল মনের সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয় এবং ঈমান আমল হারিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ ধরে। এভাবে মিশনারিগুলো তাদের (ঈমান ধংসের) লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়।

তাদের প্রত্যেক বইয়ের শেষে প্রশ্নপর্ব থাকে। সেগুলোর উত্তর প্রদানে আরো বই ও উপহারের আশ্বাস দেওয়া হয়। বইয়ের বিকৃত বিষয়ের কোন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই।

তবুও কেউ প্রশ্ন করলে তারা নীরবতার কৌশল অবলম্বন করে। এভাবে যে কোন মূল্যে পাঠক থেকে মিথ্যার সাক্ষ্য নিয়ে কুফরীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

এলাকা ও জনগণ নির্ধারণ

তারা সমগ্র বাংলাদেশকে প্রচারের আওতাভুক্ত করার জন্য ১৯৬৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা মহাপ্রদেশের অধীনে পুরো পূর্ব পাকিস্তানকে চারটি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করে, এগুলো হলো –

- চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশঃ এ ধর্মপ্রদেশের আওতাভুক্ত এলাকা প্রদেশের সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল।
- দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এ ধর্মপ্রদেশ। এ ধর্মপ্রদেশের পরিধি যমুনা নদীর পশ্চিমাঞ্চল তীর থেকে দক্ষিণে পদ্মা এবং পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত।
- খুলনা ধর্মপ্রদেশ।
- ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ।

তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বিশাল অর্থের যোগান। ১৯৯৭ সালে খ্রিস্টবাদের প্রচার সংস্থাগুলোর মধ্যে শুধু ওয়ার্ল্ড ভিশনের অর্থ পরিকল্পনা ছিল ২১২৯ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার।

নকল ইমাম তৈরি

তারা গোপনে খৃষ্টান দেশগুলোতে ছদ্মবেশী ইমাম তৈরি করে মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করে তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাদ্রীদের সম্মেলনে “জবাজ” নামক এক পাদ্রী বিশেষ সভায় সভাপতিত্বের ভাষণে বলেনঃ মুসলমানদের সাথে বিতর্কে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। তাই আমরা তাদের পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেওয়ার কৌশল

অবলম্বন করছি। এটা আমাদের সফলতার একমাত্র পথ। সুতরাং আমাদের সবাইকে দেশে বিদেশে এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইসলামি নাম ধারণ

তারা এখন ইসলামী কায়দায় নাম রাখতে শুরু করেছে, যেমন – আবদুল ওয়াহহাব, সুলতান আহমেদ পৌল ইত্যাদি। তারা আরো একধাপ এগিয়ে নিজেদের খৃষ্টান পরিচয় না দিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয় ঈসায়ী মুসলমান। তারা কালিমাও বানিয়েছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা মসীহুল্লাহ।

যুবতী প্রচারক

খৃষ্টান মিশনারির নারী সদস্যরা তাবলীগের ছদ্মবেশে মুসলিম নারীদের ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষিত খৃষ্টান নারীরা (ধর্মান্তরিত করার) লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, যাতে পরবর্তী জেনারেশনকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে। কারণ স্বামী মুসলমান হলেও পরবর্তী জেনারেশনই তাদের টার্গেট। এমনকি মহিলা ফেরীওয়ালাদের মাধ্যমে তারা ধর্মপ্রচার করে থাকে।

চিকিৎসা সেবা ও জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান:

মুসলিম সমাজে ব্যাপকহারে রোগ-ব্যাধি বিস্তার সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় মুসলিম ডাক্তারের স্বল্পতা এমনকি কোনো কোনো স্থানে না থাকার সুবাদে চিকিৎসার চাহিদা তাদের এই পদ্ধতি প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

সাধারণ শিক্ষার অন্তরালে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারঃ

কোথাও কোথাও সরাসরি খ্রিস্টান স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে তাদের এই অপতৎপরতা চলছে। আবার কোথাও কোথাও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সবার জন্য সাধারণ শিক্ষা নাম দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে, যার অন্তরালে রয়েছে তাদেরকে খ্রিস্টান বানানোর গোপণ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা। আর তাদের পাতানো উক্ত জালে বড় অংকের মুসলিম জনগোষ্ঠী পতিত হয়েছে, বিদেশী ভাষা বা বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের লোভে ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করছে। এর পরিণতিতে দেখা যায় এ মুসলিম জাতি, তাদের তাজা মস্তিষ্কসম্পন্ন, যাদের মগজ বর্তমানে সব ধরনের জ্ঞানার্জনের জন্য উন্মুক্ত, সে সব কলিজার টুকরা শিশু কিশোরদেরকে খ্রিস্টানদের হাতে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেছে চলেছে!! আর খ্রিস্টানরা যা-ই তাদেরকে প্রদান করছে এ বাচ্চারা তা-ই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করছে ।

তথ্য ও প্রচার মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারঃ

খ্রিস্টান মিশনারীদের খ্রিস্টান বানানোর অন্যতম কৌশল হচ্ছে, তথ্য ও প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার। মুসলিম বিশ্বের দিকে তাক করা রয়েছে তাদের বহু রেডিও চ্যানেল। তাছাড়া পরবর্তী কয়েক বছরে তারা শত শত টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে তুলে ধরছে তাদের বিকৃত ধর্ম ও তার প্রোগ্রামসমূহ।

এছাড়া সংবাদ পত্র, পত্র-পত্রিকা এবং তাদের অসংখ্য প্রকাশনা, প্রচারণাও এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের উক্ত দর্শনীয়, শ্রুত ও পঠিতব্য সম্প্রচার মাধ্যমগুলো খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের চাকাকে বিভিন্ন ভাবে সামনে এগিয়ে দিয়েছে, যেমন:

(ক) তারা ঐসব সম্প্রচার মাধ্যমগুলোর দ্বারা খ্রিস্টান ধর্মের তথাকথিত বানানো বৈশিষ্ট্যের প্রচার করছে। তারা বিশ্বের সকলের জন্য খ্রিস্টান ধর্মে দয়া, ভালোবাসা ইত্যাদি রয়েছে বলে মিথ্যা তথ্য প্রচার-প্রসার করে তাদের ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(খ) মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাস, তাদের ধর্মীয় নিদর্শন এবং তাদের পরস্পরের দীনী সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের বিকৃত খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আহ্বান করছে।

(গ) নগ্নতা, যৌনতা, প্রবৃত্তি উত্তেজক বিবিধ অশ্লীলতা সম্প্রচার করে দর্শকদের নৈতিক চরিত্র ও পবিত্রতা বিনষ্ট করা, লজ্জাহীন বানানো। তাদেরকে প্রবৃত্তি পূজারী ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দের মোহে নিপতিত করে ভোগের দাসে পরিণত করা। কেননা তারা এ ধরনের হয়ে গেলে তাদের যে কোনো দাওয়াত বা মিশন তাদের মাঝে সফল হবে। এমনকি মুরতাদ-কাফির হওয়ার ব্যাপারেও তাদের কোনো দ্বিধা থাকবে না। (আল্লাহ আমাদের এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন) তাদের উক্ত মিশন সফল হওয়ার ভিত্তিতে মুসলিমের অন্তর থেকে যখন ঈমানের মূলোৎপাটন হবে এবং আত্মা থেকে ধর্মীয় চেতনার বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সহজেই উক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

বস্তুত তাদের প্রকৃত অবস্থা তো তা-ই যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বিধৃত করেছেন এ বলে যে,

﴿وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠﴾ [الانفال: ٣٠]

অর্থঃ"আর তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপরীতে) কৌশল করেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল অতি উত্তম।" [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٣٢﴾ [التوبة: ٣٢]

অর্থঃ"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণতা বিধান করা ব্যতীত অন্য কিছু চান না।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩২]

বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের প্রতি অমুসলিমদের সহিংসতা এবং অপতৎপরতা

❖ ভারতের ধর্মীয় সহিংসতা

ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর একে অপরের সহিত সংঘর্ষের একটা রূপ হল ধর্মীয় সহিংসতা , যাকে দাঙ্গা বা ধর্মীয় দাঙ্গা নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দু ধর্ম, ভারতের সবচেয়ে বড় ধর্ম যা

ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮০%, ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম,মোট জনসংখ্যার ১৩%, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও শিখ ধর্ম মিলে ৩% এবং খ্রিস্টধর্ম ভারতের মোট জনসংখ্যার ২% । ধর্মীয় মৌলবাদ ভারতে একটি প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদ, খ্রীষ্টান সুসমাচার-প্রচারবাদ এবং ইসলামি মৌলবাদ অনুঘটক হিসেবে ও হিংসার বহিঃপ্রকাশে প্রাথমিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

হিন্দুদের দ্বারা মুসলিমদের উপর সহিংসতা

হিন্দুদের দ্বারা মুসলিমদের উপর হানাদার হামলার আকারে প্রায়ই সহিংসতা সংঘটিত হয়। এই আক্রমণগুলিকে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে চিহ্নিত করা হয় । সাধারণত এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার এক অংশ হিসাবে দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীতে পুরো বিশ্ব জুড়ে ইসলামফোবিয়ার উত্থানের সাথেও যুক্ত রয়েছে। বেশিরভাগ ঘটনা ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যে ঘটেছে, অন্যদিকে দক্ষিণে সাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেক কম উচ্চারণ করা হয়। সবচেয়ে বড় ঘটনার মধ্যে রয়েছে ১৯৪৬ সালে পূর্ব কলকাতার নোয়াখালী দাঙ্গার পরে ১৯৪৬ সাল বিহার ও গরমুখেশ্বরে গ্রেট কলকাতা হত্যাকাণ্ড, ১৯৪৭ সালে জম্মুতে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ, হায়দরাবাদে অপারেশন পোলোর পরে মুসলমানদের ব্যাপকহারে হত্যা, ১৯৫০ সালে বরিশাল দাঙ্গা ও ১৯৬৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তান দাঙ্গার পরে কলকাতায় মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৬৯ সালের গুজরাত দাঙ্গা, ১৯৮৪ ভীভান্দি দাঙ্গা, ১৯৮৫ গুজরাত দাঙ্গা, ১৯৮৯ ভাগলপুর দাঙ্গা, বোম্বাই দাঙ্গা, ১৯৮৩ সালে নেলি এবং ২০০২ সালে গুজরাটের দাঙ্গা , ২০১৩ সালে মুজাফফরনগর দাঙ্গা ও ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গা। সংঘাতের এই নিদর্শনগুলি দেশভাগের পর থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কয়েক ডজন গবেষণা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণ-সহিংসতার ঘটনাগুলির দলিল করেছে। ১৯৫০ সাল থেকে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ১০,০০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, ১৯৫৪ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে এবং ১৯৬৮ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে ৬,৯৩৩ জন সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে ৫৩০ জন হিন্দু এবং ১৫৯৮ জন ছিল মুসলিম, মোট ৩,৯৯৯ জন সহিংসতার ঘটনায় মারা গিয়েছিল। ১৯৮৯ সালে, ভারতবর্ষের উত্তর জুড়ে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভারতে গরু জাগ্রত সহিংসতার শিকার হওয়া ৮৪% মুসলমান ছিলেন ।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ক্ষমতায় আসার পর থেকে, ভারতের ২০ কোটি মুসলমানদের জীবনযাপন অশান্ত হয়ে পড়েছে। সন্দেহভাজন গরু ব্যবসায়ীদের গণধোলাই দিয়ে মেরেছে কিছু উগ্র হিন্দু গোষ্ঠী এবং মুসলমান মালিকানাধীন ছোট ব্যবসাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে তারা।মসজিদের বিরুদ্ধে পিটিশন ফাইল করা

হয়েছে। মুসলিম নারীদের অনলাইন "নিলাম" করা নিয়ে ইন্টারনেটে ট্রল করা হয়েছে। ডানপন্থী গোষ্ঠী এবং মূলধারার কিছু গণমাধ্যম "জিহাদ" - "লাভ জিহাদ" এর অভিযোগ দিয়ে ইসলামোফোবিয়াকে উস্কে দিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম পুরুষদেরকে বিয়ের মাধ্যমে হিন্দু নারীদের ধর্মান্তরিত করার মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে।

পাশাপাশি মুসলিম বিরোধী বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বেড়েছে- তার তিন চতুর্থাংশ বিজেপি শাসিত অঞ্চলগুলোতে ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

"ভারতের মুসলমান জনগোষ্ঠী যেন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে পড়েছেন, তারা নিজের দেশেই অদৃশ্য সংখ্যালঘু," এ কথা বলেছেন জিয়া উস সালাম, যিনি 'বিয়িং মুসলিম ইন হিন্দু ইন্ডিয়া' বইয়ের লেখক। কিন্তু বিজেপি এবং মি. মোদি ভারতে সংখ্যালঘুদের সাথে দুর্ব্যবহারের বিষয়টি অস্বীকার করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নিউজউইক ম্যাগাজিনকে বলেছিলেন, "এগুলি কিছু লোকের বক্রোক্তি যারা তাদের বিভ্রমে বাইরে গিয়ে মানুষের সাথে মেশার প্রয়োজন বোধ করে না। এমনকি ভারতের সংখ্যালঘুদের কাছেও এসব ব্যাখ্যা অচল।"

কারণ এবং প্রভাব

কিছু পণ্ডিত মুসলিম বিরোধী সহিংসতার ঘটনাগুলিকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সংগঠিত বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে নিছক " দাঙ্গা " না করে "সংগঠিত রাজনৈতিক গণহত্যা" সহ গণহত্যা , একটি রূপ বলেছেন। অন্যরা যুক্তি দেন যে, যদিও তাদের সম্প্রদায় বৈষম্য এবং সহিংসতার সম্মুখীন হয়, কিছু মুসলমান অত্যন্ত সফল হয়েছে, যে সহিংসতা যতটা দেখা যাচ্ছে ততটা বিস্তৃত নয়, তবে স্থানীয় সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার কারণে নির্দিষ্ট শহুরে এলাকায় সীমাবদ্ধ এবং এমন অনেক শহর রয়েছে যেখানে মুসলিম এবং হিন্দুরা শান্তিপূর্ণভাবে একসাথে বসবাস করে যেখানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রায় কোন উদাহরণ নেই।

চীনে অমুসলিমদের অপতৎপরতা

চীন এক উদীয়মান পরাশক্তি। হাঁটছে ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির পথে। বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থায়ও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে দেশটি। চীনে ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত পরিস্থিতি জটিল এবং তা সরকার-নিয়ন্ত্রিত। চীনের সরকার ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর ওপর কঠোর নজরদারি রাখে, বিশেষত মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর। কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা যায়:

- **উইঘুর মুসলিমদের নিপীড়ন**:

উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিক অঞ্চলের আগের নাম 'পূর্ব তুর্কিস্তান'। এটির বর্তমান জিনজিয়াং প্রদেশে। চীন সরকার এ অঞ্চলকে জিনজিয়াং নাম দিয়েছে। ৯০ লাখ মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলের প্রায় ১০ লাখ উইঘুর নারী-পুরুষ বন্দি রয়েছে সুরক্ষিত বন্দি শিবিরে। চীনের শিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীনা সরকারের কঠোর দমননীতি রয়েছে। সেখানকার মুসলিমদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সীমিত করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে, চীন সরকার তাদের "পুনঃশিক্ষা ক্যাম্পে" আটক রাখছে এবং জোরপূর্বক সংস্কৃতি পরিবর্তনের চেষ্টা করছে।মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, এসব ক্যাম্পে তাদেরকে 'নতুন করে শিক্ষা' দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বেইজিং সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।কিন্তু একইসাথে শিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী লোকজনের ওপর চীন সরকারের নিপীড়নমূলক নজরদারির তথ্যপ্রমাণ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।উইঘুরদের বেশিরভাগই মুসলিম। চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং অঞ্চলে এদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি দশ লাখ।

- **ধর্মীয় স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা**:

চীন আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নাস্তিক রাষ্ট্র এবং সরকার ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। শুধুমাত্র সরকার-অনুমোদিত ধর্মীয় কার্যক্রম চালানো যায়। এতে মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী ভুক্তভোগী।

- **জাতিগত উত্তেজনা**:

চীনের হান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে নানা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে কিছু অঞ্চলে উত্তেজনা বিদ্যমান।

চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যালঘু, বিশেষত উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ বেশ কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচিত। এই নির্যাতন বিভিন্ন ধরনের, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ

চীন সরকার জিনজিয়াং অঞ্চলে মুসলিমদের ওপর ব্যাপক নজরদারি চালাচ্ছে। এটি ক্যামেরা পর্যবেক্ষণ, মুখ চিনতে সক্ষম প্রযুক্তি, এবং ডিজিটাল নজরদারির মাধ্যমে করা হয়।

২. বন্দিশিবির (ডিটেনশন ক্যাম্প)

জিনজিয়াংয়ে তথাকথিত "পুনঃশিক্ষা ক্যাম্প" স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে লক্ষাধিক উইঘুর মুসলিমকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এই ক্যাম্পগুলোতে নির্যাতন, জোরপূর্বক আদর্শ শিক্ষা, এবং ধর্মীয় বিশ্বাস পরিত্যাগে বাধ্য করার অভিযোগ রয়েছে।

৩. ধর্মীয় স্বাধীনতায় বাধা

উইঘুর মুসলিমদের মসজিদে যাওয়া, রোজা রাখা, কোরআন পড়া, এবং ধর্মীয় পোশাক পরিধানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

৪. জোরপূর্বক শ্রম

অভিযোগ রয়েছে যে, উইঘুর মুসলিমদের জোরপূর্বক শ্রমে নিয়োজিত করা হচ্ছে, বিশেষত তুলা চাষ এবং পোশাক কারখানায়।

৫. সংস্কৃতির ধ্বংস

চীন সরকার উইঘুর সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের নিদর্শনগুলো ধ্বংস করছে, যেমন মসজিদ ও ঐতিহাসিক স্থান ধ্বংস করা।

৬. পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা

বিভিন্ন পরিবারকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে শিশুরা তাদের বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারি হেফাজতে বেড়ে উঠছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

জাতিসংঘ, মানবাধিকার সংগঠন, এবং বিভিন্ন দেশ চীনের এই আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এবং আরও কিছু দেশ চীনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তবে চীন এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করে বলছে যে এটি সন্ত্রাসবাদ এবং চরমপন্থার বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপ।

সহিংসতার ব্যাপারে যা জানা যায়ঃ

চীন সরকারের দাবি তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী একটি ইসলামপন্থী গ্রুপের সন্ত্রাসী তৎপরতা মোকাবেলা করছে।বেইজিং বলছে, উইঘুর মুসলিমদের কেউ কেউ জঙ্গি গ্রুপ ইসলামিক স্টেটে যোগ দিয়েছে।কিন্তু মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, সেখানকার লোকজনের ওপর চীনের দমন-পীড়নের কারণেই সেখানে সহিংসতার ঘটনা ঘটছে।সরকারের পক্ষ থেকে এসব হামলার জন্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দায়ী করা হয়েছে। বেইজিং বলছে, শিনজিয়াং-এর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা চীনের অন্যত্রও হামলা চালিয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে তারা তিয়েনানমেন স্কয়ারে গাড়ি দিয়েও হামলা করেছিল।

চীনের সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার মিশেল ব্যাশেলেতের বহুপ্রতীক্ষিত প্রতিবেদনকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিবেদনে এ

উপসংহার টানা হয়েছে, জিনজিয়াং নিয়ে বেইজিংয়ের নীতি মানবতাবিরোধী অপরাধের শামিল হতে পারে।জিনজিয়াং নিয়ে প্রতিবেদন করতে চীনে অনেক বছর কাটিয়েছেন বিবিসির জন সুডওয়ার্থ। ফলাফল হিসেবে চীন ছাড়তে কার্যত বাধ্য হন তিনি। চীন সম্পর্কে এটি আমাদের কী বার্তা দেয়, তা পরিষ্কার।চীন সরকার এ বন্দি শিবিরকে 'চরিত্র সংশোধনাগার' নাম দিয়েছে। চীন সরকারের দাবি, উশৃংঙ্খল অবস্থা থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষা দিতেই তাদের এ কার্যক্রম। চরিত্র সংশোধনাগারের নামে চীন সরকার এ সব মুসলিমদের প্রতি চরম অত্যাচার ও নির্যাতন করছে বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তা উঠে এসেছে।মুসলিম নির্যাতনের এসব তথ্য যাতে চীনের বাইরে যেতে না পারে সেজন্য তারা প্রতিনিয়িত মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগে বিধি-নিষেধ আরোপ করছে। সরকারিভাবে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য জিনজিয়াং প্রদেশে ভ্রমণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।চীন সরকার কর্তৃক এসব অত্যাচার নির্যাতনে এখনও কোনো উইঘুর মুসলিম প্রতিরোধমূলক কিংবা আত্মরক্ষামূলক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তারপরও দেশটির সরকার উইঘুর মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে বর্হিবিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে প্রবাহিত করছে। অথচ দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা পায়নি তারা।

ফিলিস্তিনে অমুসলিমদের অপতৎপরতা

ফিলিস্তিনে বিভিন্ন ধর্ম এবং সংস্কৃতির মানুষের উপস্থিতি হাজার বছরের পুরোনো। এটি একটি বহু ধর্মীয় এবং বহু সাংস্কৃতিক এলাকা। ফিলিস্তিনে অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে খ্রিস্টান, ইহুদি, এবং অন্য কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে।

ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল সংঘাত মূলত রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ভিত্তিতে নয়, বরং ভূমি অধিকার এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে। এই সংঘাতের মূলে রয়েছে ভূমি দখল, বসতি স্থাপন, এবং অধিকার রক্ষার সংগ্রাম।

অপতৎপরতা বা অভিযোগ

যদি "অমুসলিমদের অপতৎপরতা" বলতে কোনো বিশেষ কর্মসূচি বা রাজনৈতিক পদক্ষেপ বোঝানো হয়, তবে সাধারণত এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক এজেন্ডা বা সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে ইসরায়েলি প্রশাসনের কার্যক্রম বা বসতি স্থাপনের পরিকল্পনাকে ফিলিস্তিনিরা অপতৎপরতা হিসেবে দেখে থাকে। তবে এটি রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং আধিপত্য বিস্তারের বিষয়, যা ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়েও বড়।

গুরুত্বপূর্ণ দিক:

1. **ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান:** ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনে মুসলিম, খ্রিস্টান, এবং ইহুদিদের মধ্যে সহাবস্থান ছিল। তবে আধুনিক রাজনীতির কারণে এই সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেছে।
2. **রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব:** ইসরায়েলি নীতি এবং আন্তর্জাতিক সমর্থনের কারণে অনেক সময় ফিলিস্তিনিদের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।
3. **মানবাধিকার লঙ্ঘন:** উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাত এবং সহিংসতার ফলে নিরীহ জনগণ প্রভাবিত হয়।

ফিলিস্তিনে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন বহু দশক ধরে চলমান একটি জটিল ও দুঃখজনক বিষয়। এটি মূলত ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের অংশ, যেখানে ফিলিস্তিনি জনগণ তাদের ভূমি, অধিকার, এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংঘাতের পেছনে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, এবং ভৌগোলিক নানা কারণ রয়েছে।

নির্যাতনের কিছু দিক:

- **ভূমি দখল ও বসতি স্থাপন**:

ইসরায়েল সরকার নিয়মিতভাবে ফিলিস্তিনি ভূমি দখল করে সেখানে ইহুদি বসতি স্থাপন করছে। এটি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হলেও এই কার্যক্রম থামানো যাচ্ছে না।

- **বাধা এবং নিষেধাজ্ঞা**:

গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দ্বারা আরোপিত বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা ফিলিস্তিনি জনগণের জীবনযাত্রা কঠিন করে তুলেছে। খাদ্য, চিকিৎসা, এবং অন্যান্য মৌলিক সেবা প্রাপ্তিতে তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

- **সহিংসতা এবং হত্যাকাণ্ড:**

ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে ফিলিস্তিনিদের হত্যা, আহত করা, এবং ঘরবাড়ি ধ্বংস করা সাধারণ ঘটনা। শিশু এবং মহিলারাও এই সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা, চেকপয়েন্ট এবং দেয়াল নির্মাণের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের চলাচলে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া বোমা হামলা, অবরোধ এবং সামরিক অভিযানের কারণে গাজা উপত্যকা সহ পুরো ফিলিস্তিনি অঞ্চলে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও জড়িত হয়েছে, এবং অনেকেই ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করেছে। ফিলিস্তিনের জনগণের স্বাধীনতা এবং অধিকারের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমর্থন রয়েছে, তবে সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানে দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকরী পদক্ষেপ এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।ফলস্বরূপ, ফিলিস্তিনে মুসলিম জনগোষ্ঠী মানবিক

সহায়তার অভাব, বসতি হারানো, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগ, এবং প্রতিদিনের সহিংসতার মতো নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।

- **ধর্মীয় স্থান দখল:**

জেরুজালেমে অবস্থিত আল-আকসা মসজিদে মুসলিমদের প্রবেশাধিকারে বাধা এবং সেখানে হামলার ঘটনা ঘটছে। এটি ধর্মীয় দিক থেকেও বিশ্ব মুসলিমদের কাছে গভীর উদ্বেগের বিষয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:

অনেক দেশ এবং সংগঠন ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানালেও কার্যকর কোনো সমাধান বা পদক্ষেপ এখনও দেখা যায়নি। জাতিসংঘ ও অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করলেও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি। স্থায়ী শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে উভয় পক্ষের মধ্যে আন্তরিক আলোচনার প্রয়োজন। পাশাপাশি, সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।এক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হওয়া উচিত।

স্পেনে অমুসলিমদের অপতৎপরতা

স্পেন, ইউরোপীয় ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই স্পেনের সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ সাধিত হয় মুসলিম শাসনামলে। ৭১১ সালে জিব্রাল্টারে তারিক বিন জিয়াদের অবতরণের মধ্য দিয়ে যার সূচনা হয়েছিল। দীর্ঘ সাতশো আশি বছরে মুসলিম শাসনামলে আইবেরিয়ান উপকূল পরিণত হয় সমস্ত ইউরোপের সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে। উঠে আসেন ইবনে রুশদ্, আব্বাস ইবনে ফিরনাস এবং ইবনে তোফায়েলের মতো মুসলিম পণ্ডিতেরা। একদিকে যেমন স্পেন তথা ইউরোপের প্রথম সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয় মুসলিমদের হাত ধরে ঠিক তেমনি সেই মুসলিমরাই দীর্ঘদিন ধরে নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিল স্পেনের মাটিতেই। এক পর্যায়ে স্পেন থেকে সমূলে উৎখাটিত হলো মুসলিমরা ।

স্পেনে মুসলিমদের উপর নির্যাতন ইতিহাসের একটি জটিল ও বেদনাদায়ক অধ্যায়। বিশেষ করে মধ্যযুগে আন্দালুসিয়া অঞ্চলে মুসলিম শাসনের পতনের পর (৮ম থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত), মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দমন করার জন্য নানা ধরনের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এখানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং মূল ঘটনাগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. আন্দালুসিয়ার মুসলিম শাসন ও পতন

- আন্দালুসিয়া (বর্তমান স্পেন ও পর্তুগালের একটি অংশ) ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিমদের শাসনের আওতায় আসে। প্রায় ৮০০ বছর ধরে সেখানে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প এবং স্থাপত্যের উন্নতি ঘটে।
- ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতনের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের শেষ হয়। এরপরে ক্যাথলিক মোনার্কস (ফার্ডিন্যান্ড এবং ইসাবেলা) অঞ্চলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে। ক্যাথলিক কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের লোমহর্ষক ও বিভীষিকাময় ইতিহাস থেকে জানা যায় , মুসলিম কিশোরীদের ধর্মান্তরিত করার জন্য টেনে হিচরে নিয়ে যাওয়া হতো, তাদের চিতকারে সমস্ত এলাকা ভারি হয়ে উঠতো ।

২. রেকনকোয়েস্টা ও এর পরিণতি

- রেকনকোয়েস্টার সময় মুসলিমদের ধর্মান্তরিত হওয়া বা দেশত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। ৮ম শতাব্দীতে, মুসলিম বাহিনী দক্ষিণ স্পেনে প্রবেশ করে এবং "আন্দালুস" নামক মুসলিম শাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। এটি প্রায় ৭৮০ বছর ধরে স্থায়ী ছিল, যার মধ্যে মুসলিম শাসনে স্পেনের বেশিরভাগ এলাকা ছিল। তবে **১১শ** শতক থেকে, খ্রিস্টান রাজারা স্পেনের মুসলিম শাসিত অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ শুরু করে এবং ধীরে ধীরে মুসলিমরা তাদের জমি হারাতে থাকে। রেকনকিস্তা পর্বের শেষ দিকের বড় ঘটনা ছিল গ্রানাডার পতন (1492), যেখানে গ্রানাডা শহরটি মুসলিমদের শেষ শক্তি কেন্দ্র ছিল এবং এটি খ্রিস্টান রাজা ফার্দিনান্দো এবং ইসাবেলা দ্বারা দখল করা হয়।
- যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের মোরিস্কোস (Moriscos) বলা হতো। তবে তাদের ওপরও সন্দেহ ও নিপীড়ন অব্যাহত ছিল।

৩. ইনকুইজিশন (Inquisition)

- ১৪৭৮ সালে স্প্যানিশ ইনকুইজিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে ধর্মান্তরিত মুসলিম এবং ইহুদিদের পরীক্ষা করা হতো, তারা সত্যিই খ্রিস্টধর্ম পালন করছে কি না।
- যারা খ্রিস্টধর্ম পালন করতে ব্যর্থ হতো বা গোপনে ইসলামিক রীতিনীতি পালন করতো, তাদের শাস্তি দেওয়া হতো। শাস্তির মধ্যে ছিল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কারাদণ্ড, এমনকি মৃত্যুদণ্ড।

৪. মোরিস্কোসদের দেশত্যাগ

- ১৭ শতকের শুরুতে, মুসলিমদের আরও কঠোরভাবে দমন করা হয়। স্পেনে তখন "মোরিস্কো" (Morisco) নামে পরিচিত মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময় শুরু হয়। ১৫১৭ সালের পর স্পেনের মুসলিমরা অল্প সংখ্যায় "মোরিস্কো" হিসেবে থাকতে থাকে, যারা মুসলিম ধর্মকে গোপনে পালন করত। ১৬০৯ সালে, স্পেনের রাজা ফিলিপ ৩ মুসলিম মোরিস্কোদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন, যার ফলে লাখ লাখ মোরিস্কোকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করা হয়।
- ১৬০৯-১৬১৪ সালের মধ্যে স্পেনের মুসলিম বংশোদ্ভূত প্রায় ৩ লাখ মোরিস্কোসকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। এ সময় অনেকেই মারা যায়, এবং যারা টিকে থাকে, তারা উত্তর আফ্রিকা বা অটোমান সাম্রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

৫. আধুনিক প্রতিচ্ছবি

মুসলিমদের প্রতি অতীতের এই নির্যাতনের ছাপ এখনো স্পেনের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে রয়ে গেছে। বর্তমানে স্পেনে মুসলিমদের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু ক্রমবর্ধমান সম্প্রদায় রয়েছে, যারা প্রধানত অভিবাসীদের মাধ্যমে এসেছে। স্পেনের বর্তমান মুসলিম জনগণের সংখ্যা প্রায় ২.৫ মিলিয়ন, যারা মূলত আফ্রিকা, বিশেষ করে মরক্কো এবং অন্যান্য আরব দেশ থেকে এসেছেন। তবে, অতীতের নির্যাতন ও সংস্কৃতিক বিভাজন আজও কিছু ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। এছাড়া, পশ্চিমা দেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মনোভাব ও আক্রমণের ঘটনা এখনও ঘটে, যদিও তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্পেনের রাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রতিফলিত হয় না।

নির্যাতনের কিছু ঘটনা

৯০ বছরের বৃদ্ধা মুসলিম মহিলাকে একটা গাধার পিঠে চড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হয়েছিল এবং ১০ ডুকাড জরিমানাও করা হয়েছিল, তাঁর একটাই অপরাধ তাঁর কাছে একটি কুরআনের কপি ছিল। একবার আশ্রয়হীন বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রীলোকেরা একটি বড় মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিল। আশ্রিত মানুষসহ মসজিদটিকে বারুদের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এক ইতিহাসবিদের বর্ননায় তিনি বলেন, “সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা এমন ছিল যে তা লিখতে কলম অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে। আমি নিজে একজন মুসলিম নারীর ক্ষত বিক্ষত লাশ সটান হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি, যার চারপাশে তার সন্তানদের ছয়টি মৃত দেহ পড়েছিল”। সেখানে মুসলিমদের একটি জাহাজে ভরে সেটা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বহু মুসলিমকে অন্যায় ভাবে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছিল, ফাঁসির মঞ্চে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হতো সে খৃস্টান নাকি মুসলিম হয়ে মরতে চায়? মুসলিম বললে তাকে স্বাভাবিক ফাঁসি না দিয়ে চতুর্দিক থেকে পাথর ছুড়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হতো।

এভাবেই দীর্ঘদিন জুলুম নির্যাতন করে স্পেনের মুসলিমদের সমূলে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তারিক বিন জিয়াদ, ৭১১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১২ হাজার মুসলিম সৈন্যের মাধ্যমে এই স্পেনকে দখল করে ইসলামের পতাকা উড্ডিন করেছিলেন। দীর্ঘ ৭৮০ বছর এই স্পেনকে মুসলমানরাই শাসন করেছিল। জানা যায়, শাসকরা নিজেদের মনগড়া মতবাদে দেশ চালাতো। প্রজাদের বঞ্চিত রেখে নিজেরা বিলাস বহুল জীবন যাপন করতো, নিজেদের বসবাসের জন্য প্রাসাদ অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল, অট্টালিকার সৌন্দর্য বর্ধনে নারীদের মুর্তি স্থাপন করেছিল, নিজেদের সুবিধার্থে আইন প্রণয়ন করতো, প্রজাদের ক্ষেত্রে ছিল দমনমূলক আইন, অনেক শাসক মুসলিম হয়েও আলেম ওলামাদের ওপর জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিল।মোট কথা প্রাথমিক সময়ে স্পেনের শাসনে শাসকরা বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও তাঁর খলিফাদের নীতি অনুসরণ করলেও পরবর্তীতে তারা তা ভুলে গিয়েছিল। পরিনামে মুসলিমরা স্পেন থেকে সমূলে বিতাড়িত হয়েছিল।

ফ্রান্সে অমুসলিমদের অপতৎপরতা

ফ্রান্সে মুসলিমদের প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে মেনে চলার বিষয়ে ফ্রান্স সরকারের কিছু সিদ্ধান্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় হলো:

১. হিজাব ও ধর্মীয় পোশাক নিষেধাজ্ঞা

ফ্রান্সে পাবলিক স্কুলে হিজাব এবং অন্যান্য ধর্মীয় পোশাক পরার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ২০০৪ সালে এ আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০১০ সালে ফ্রান্স সরকার জনসমক্ষে পুরো মুখ ঢেকে রাখা বোরকা বা নিকাব নিষিদ্ধ করে। এসব আইনকে কেউ কেউ নারীর অধিকার রক্ষার চেষ্টা হিসেবে দেখেন, তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই এটি ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর আঘাত হিসেবে বিবেচনা করেন।

২. ইসলামিক সংগঠন ও মসজিদে নজরদারি

ফ্রান্সে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশঙ্কায় কিছু ইসলামিক সংগঠন ও মসজিদের কার্যক্রমের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। ২০২০ সালে প্যাটি হত্যার ঘটনার পর ফ্রান্স সরকার ধর্মীয় উগ্রবাদ মোকাবিলায় "সেপারেটিজম বিল" পাস করে, যা কিছু মুসলিম সংগঠনের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে।

৩. ইসলামফোবিয়া ও বৈষম্যের অভিযোগ

অনেক মুসলিম নাগরিক অভিযোগ করেন, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা, এবং দৈনন্দিন জীবনে তারা বৈষম্যের শিকার হন। ইসলামফোবিয়া এবং মুসলিমবিরোধী মনোভাব কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান। ইসলামিক কাউন্সিল এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ফ্রান্সে মুসলিমদের সাথে হওয়া আচরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

৪. ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই

ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি, যা রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা রাখতে চায়, অনেক সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চর্চার ওপর বাধা সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ করা হয়। রাষ্ট্রের এই নীতিকে কেউ কেউ সমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হিসেবে দেখেন, আবার কেউ মনে করেন এটি সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করে।

৫.নবীজি (সঃ) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন

২০২০ সালে ফ্রান্সের একটি স্কুলে নবীজি (সঃ) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করা হয় ইসলাম কে অবমাননা করার জন্য।তারা নবীজি (সঃ) কে অপমান করে।সেখানে এরপর একজন স্কুল শিক্ষকের শিরচ্ছেদের ঘটনা ঘটে এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোর কিছু মন্তব্যের প্রতিবাদে জর্ডান ও কুয়েতসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

এ বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তবে, ফ্রান্স সরকার তাদের নীতিকে ধর্মনিরপেক্ষতার মান রক্ষা এবং সবার জন্য সমান অধিকারের নিশ্চয়তা হিসাবে ব্যাখ্যা করে।

সুইজারল্যান্ডে অমুসলিমদের অপতৎপরতা

সুইজারল্যান্ড একটি ধর্মীয়ভাবে বহুমুখী দেশ, যেখানে ইসলামের পাশাপাশি খ্রিস্টান, ইহুদি এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা বসবাস করে। সুইজারল্যান্ডে মুসলিমদের প্রতি নির্যাতনের বিষয়টি কিছুটা জটিল এবং এর পটভূমিতে রয়েছে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রভাব। মূলত, ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো, সুইজারল্যান্ডেও কিছু বছরে অভিবাসন এবং ইসলাম-সম্পর্কিত বিতর্ক দেখা গিয়েছে। দেশটির জনগণের একটি অংশ মুসলিম অভিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার সাথে মানিয়ে নিতে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করেছে।

তবে, মাঝে মাঝে কিছু অমুসলিম গোষ্ঠী বা ব্যক্তির কার্যকলাপ মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরনের অপতৎপরতাগুলি মূলত তিনটি ক্ষেত্রে দেখা যায়:

১. ইসলামোফোবিয়া বা মুসলিম-বিরোধী মনোভাব

- কিছু অমুসলিম গোষ্ঠী বা রাজনীতিক ইসলামের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালায়।

- মুসলিম মহিলাদের হিজাব বা বোরকা পরা নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। ২০২১ সালে সুইজারল্যান্ডে একটি গণভোট হয়।এতে মুখ ঢাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পক্ষে রায় দেন দেশটির সাধারণ মানুষ। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই গণ রায় কার্যকর করা হবে। যা 'বোরকা নিষিদ্ধ' নামে পরিচিত। ওই সময় থেকে কেউ যদি বোরকা পরেন এবং মুখ ঢাকেন তাহলে তাদের প্রায় ১ হাজার ১৫০ ডলার জরিমানা করা হবে। যা বাংলাদেশি অর্থে দেড় লাখ টাকার সমান।তবে ওই গণভোটের কঠোর বিরোধীতা করেছিল মুসলিম গ্রুপগুলো।এছাড়া পাবলিক প্লেসে মুখ ঢাকা নিষিদ্ধের গণভোটে অনেকেই বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। যদিও সুইজারল্যান্ডে খুব কম সংখ্যক মানুষ মুখ ঢাকা বোরখা পরেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিমদের জন্য এটি একটি কঠিন বিষয় হতে পারে।দেশটির সরকার জানিয়েছে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য মুখ ঢাকা যাবে। কিন্তু এজন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে। এই নিষেধাজ্ঞা বিমান, কূটনৈতিক এবং কনস্যুলার এলাকায় কার্যকর হবে না। এছাড়া ধর্মীয় ও পবিত্র স্থানগুলোতেও মুখ ঢাকা যাবে।
- কিছু গোষ্ঠী মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করে এবং মিনার নিষিদ্ধ করারও দাবি জানায়। ২০09 সালে মিনার নির্মাণ নিষেধাজ্ঞা করা হয়, যেখানে একটি গণভোটের মাধ্যমে মিনার নিষিদ্ধ করা হয়।

২. বর্ণবাদ ও বৈষম্য

- কিছু মুসলিম পরিবার বাড়ি ভাড়া পাওয়া বা চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়।
- কিছু অমুসলিম ব্যক্তি বা সংগঠন মুসলিম সম্প্রদায়কে আক্রমণাত্মক ভাষায় টার্গেট করে।

৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংঘাত

- সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কার্যকলাপ, যেমন ঈদ উদযাপন বা হালাল খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ে মাঝে মাঝে বিরোধ দেখা যায়।
- কিছু স্কুল বা প্রতিষ্ঠান মুসলিম ছাত্রদের ধর্মীয় চর্চার (যেমন নামাজ বা রোজা) বিষয়ে সহযোগিতামূলক নাও হতে পারে।

সুইজারল্যান্ডের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া

- সুইজারল্যান্ডের মুসলিম সংগঠনগুলো সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার চেষ্টা করে।

- আইনানুগ উপায়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- মুসলিম সম্প্রদায় স্থানীয় সমাজে নিজেদের আরো ভালোভাবে উপস্থাপনের জন্য সামাজিক কার্যক্রম এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করছে।

সুইজারল্যান্ডের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলেও, কিছু ক্ষেত্রে অপতৎপরতা বা বৈষম্য দূর করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

তবে, সুইজারল্যান্ডে সরাসরি মুসলিমদের ওপর শারীরিক নির্যাতন বা নিপীড়নের ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে মুসলিমদের সামাজিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক চাপে রাখা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপের অভিযোগ উঠেছে। এই ধরনের পদক্ষেপগুলি কিছু সময় বিতর্কিত হিসেবে দেখা হয়, এবং এটিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি বৈষম্যমূলক আচরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

সুইজারল্যান্ড সরকার ও নাগরিক সমাজ এই ধরনের প্রশ্নগুলোর সমাধানে একধরনের ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছে। সংবিধান অনুসারে সুইজারল্যান্ডে সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানোর কথা বলা হয়েছে।

আমেরিকায় অমুসলিমদের অপতৎপরতা

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা সংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তবে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও নির্যাতনের ঘটনাগুলো কখনো কখনো বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়। আমেরিকায় মুসলিমদের উপর নির্যাতনের বিষয়টি একটি জটিল এবং সংবেদনশীল ইস্যু। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ঘটনা এবং পরিস্থিতি সামনে এসেছে যা বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের প্রতি বৈষম্য, ঘৃণা বা বৈষম্যমূলক আচরণের প্রমাণ দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো ঘটে নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, যেমন কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা বা ইসলামফোবিক ধারণার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে।এগুলো সাধারণত নিম্নোক্ত কারণে হতে পারে:

১. ইসলামফোবিয়া:

৯/১১ সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামফোবিয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অনেকেই ভুল ধারণা থেকে মুসলিমদের সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখে।

২. বৈষম্যমূলক আচরণ:

- কর্মস্থল, স্কুল, এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মুসলিমরা অনেক সময় বৈষম্যের শিকার হন।
- মুসলিম নারীরা, বিশেষ করে যারা হিজাব পরেন, প্রায়ই হয়রানির শিকার হন।

৩. ঘৃণাসূচক অপরাধ (Hate Crimes):

মুসলিমদের ওপর হামলা, মসজিদে অগ্নিসংযোগ বা ধ্বংস করার ঘটনা মাঝেমধ্যে ঘটে। এই ধরনের অপরাধ ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে সংঘটিত হয়।

৪. মিডিয়ার ভূমিকা:

মিডিয়ায় মুসলিমদের ভুলভাবে উপস্থাপন করা হলে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে এবং বৈষম্যকে উস্কে দেয়।

৫. আইনি ও রাজনৈতিক নীতিমালা:

কিছু ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর নির্দিষ্টভাবে নজরদারি বা তদন্ত চালানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার উপর অভিযোগ রয়েছে যে, তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর অতিরিক্ত নজরদারি চালায়। এই ধরনের আচরণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে ভীতি এবং অবিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারে।কখনো কখনো মার্কিন সরকারের নীতিমালা, যেমন ২০১৭ সালে "মুসলিম ব্যান", মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অনুভূতি জাগায়।

৬.ভিসা এবং অভিবাসন সংক্রান্ত ইস্যু:

মুসলিম-প্রধান কিছু দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং ভিসা নীতিমালা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। এমনকি মুসলিম দেশগুলোর ভ্রমণকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সময় বেশ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।এই পরিস্থিতি সমাধানের জন্য মুসলিম সংগঠনগুলো, মানবাধিকার সংস্থাগুলো, এবং নাগরিক অধিকার সংগঠনগুলো নিয়মিত কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থাও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে বদ্ধপরিকর।

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর আমেরিকায় মুসলমানদের ভয়ানক এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। সারা দেশেই তাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক ঘটনা বেড়ে যায়, বিভিন্ন স্থানে তারা আক্রমণেরও শিকার হয়।এমনকি প্রশ্ন তোলা হয় আমেরিকার প্রতি তাদের আনুগত্যের ব্যাপারেও।দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর হিসেবে, ওই বছর মুসলিম ও আরবদের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ-জনিত অপরাধ বেড়ে যায় এক হাজার সাতশ শতাংশ।১১ই সেপ্টেম্বরের ওই হামলার পর পরই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিমরা নানা ধরনের হয়রানির শিকার হন।এমনকি প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালিয়ে মসজিদের ওপর উঠিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও তখন ঘটেছে।তখন অনেক অঙ্গরাজ্যের মুসলিমরা প্রাণের ভয়ে তাদের দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। নাইন/ইলেভেন নামে পরিচিত এই হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিমরা হঠাৎ করেই দেখতে পান তারা যে দেশপ্রেমিক সেটাও তাদের প্রমাণ করতে হচ্ছে।কেভিন জেমস নামের একজন বলছিলেন, "মুসলিম কমিউনিটিকে তখন বলতে হয় যে আমরাও আমেরিকান। এ এক ভয়ানক অবস্থা। তাদেরকে বলতে হয় যে এই হামলার সঙ্গে আমাদের ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।"

ফিলিস্তিনের গাজা যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে মুসলিমবিদ্বেষ। একই সঙ্গে বেড়েছে মুসলমানদের ওপর হামলা ও বৈষম্যের ঘটনা। চলতি বছরের প্রথমার্ধে এ ধরনের ঘটনা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ বেড়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন মুসলমানদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার থাকা সংগঠন কাউন্সিল অন আমেরিকান–ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর)।

মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলো বলছে, গত বছরের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হয়। ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের হামলার পর থেকে গাজায় নির্বিচার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। সেখানে নিহত হয়েছেন ৩৯ হাজার ৪০০ জন। এরই মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, ইসলামবিদ্বেষ ও ফিলিস্তিনবিদ্বেষ বেড়েছে বিশ্বজুড়েই। একই সঙ্গে বাড়ছে ইহুদিবিদ্বেষও।

আজ মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে সিএআইআর বলছে, ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে তাদের কাছে মুসলিম ও ফিলিস্তিনবিরোধী ঘটনাসংক্রান্ত ৪ হাজার ৯৫১টি অভিযোগ এসেছে। এটি ২০২৩ সালের একই সময়ের তুলনায় ৭০ শতাংশ বেশি। সে বছরে মোট অভিযোগ এসেছিল ৮ হাজার ৬১টি। এর মধ্যে ৩ হাজার ৬০০টিই গাজা যুদ্ধ শুরুর পর বছরের শেষ তিন মাসে এসেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে গত ৯ মাসে মুসলমানদের ওপর হামলার বেশ কিছু উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে। যেমন গত বছরের অক্টোবরে ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত ছয় বছরের এক মার্কিন শিশুকে ছুরিকাঘাত, নভেম্বরে ভারমন্টে ফিলিস্তিনি তিন ছাত্রকে গুলি, গত ফেব্রুয়ারিতে টেক্সাসে ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত এবং মে মাসে ভারমন্টে ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত তিন বছরের এক শিশুকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যাচেষ্টার মতো ঘটনা।

গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটেছে। সিএআইআরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ হয়। এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হয় মার্কিন পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ব্যাপক ধরপাকড় চালানো হয়। দেশটিতে ফিলিস্তিনবিরোধী বিক্ষোভও হয়েছে।

মুসলমানদের ওপর হামলা ও বৈষম্যের এ অভিযোগগুলো সংগ্রহ করতে সরকারি বিবৃতি ও বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পাওয়া ভিডিওর সহায়তা নিয়েছে সিএআইআর। মানুষের সঙ্গে কথা বলে, ই-মেইলে, এমনকি ইন্টারনেটে অভিযোগ করার ব্যবস্থার মাধ্যমেও তা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া গণমাধ্যমে যেসব ভুক্তভোগীর তথ্য পাওয়া গেছে, তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে সিএআইআর।

যুক্তরাজ্যে অমুসলিমদের অপতৎপরতা

যুক্তরাজ্যে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যদিও যুক্তরাজ্য সাধারণত বহুজাতিক এবং বহু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানের দেশ, তবুও কিছু সময়ে ইসলামফোবিয়া এবং মুসলিম বিরোধী সহিংসতা দেখা গেছে। বিভিন্ন সময়ে মুসলিমদের লক্ষ্য করে ঘৃণাত্মক মন্তব্য, সামাজিক বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, এবং শারীরিক হামলার ঘটনা ঘটেছে।

বিভিন্ন গবেষণা ও রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মুসলিমদের মধ্যে নারীরা এবং বিশেষত যারা হিজাব বা নিকাব পরেন, তারা ইসলামফোবিক আক্রমণের শিকার হন বেশি। ২০১৩ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, যুক্তরাজ্যে মুসলিমদের উপর আক্রমণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাধারণত ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব থেকে আসে। যুক্তরাজ্যের সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এই ধরনের বিদ্বেষমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। তারা সচেতনতা বৃদ্ধি, ইসলামফোবিয়া বিরোধী আইন প্রণয়ন এবং সহিংসতার শিকারদের জন্য সহায়তা প্রদান করছে। তবে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে এই পরিস্থিতির উন্নতি এবং অবনতি ঘটে থাকে, যা ইসলামী সম্প্রদায়ের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি উগ্র ডানপন্থীদের দাঙ্গার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন মুসলিমরা। চলমান এ দাঙ্গার পূর্বে মাত্র ১৬ শতাংশ মুসলিম নাগরিক যুক্তরাজ্যে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানাতেন। ২০ শতাংশ মুসলিম জানান তারা জুলাইয়ের শেষ দিকে সাউথপোর্টে একটি ক্লাবে একটি ছুরিকাঘাতের ঘটনার আগে হিংসার শিকার হয়েছিলেন। মুসলিম ওমেন’স নেটওয়ার্ক নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপে এসব চিত্র উঠে আসে।আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, মুসলিম ওমেন’স নেটওয়ার্কের জরিপে বলা হয় বর্তমানে অন্তত ৭৫ শতাংশ মুসলিম ব্রিটিশ মনে করছেন তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের সাউথপোর্ট শহরে একটি নাচের কর্মশালায় ছুরিকাঘাতে তিন শিশু নিহত হয়। ওই হামলার জন্য এক মুসলিম শরণার্থী দায়ী, অনলাইনে এমন গুজব ছড়িয়ে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটানো হয়েছিল। যদিও ওই হামলার পেছনে ১৭ বছর বয়সী অ্যালেক্স রুদাকুবানা নামে একজনকে অভিযুক্ত করা হয়। সে কারডিফে জন্মগ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার পর, অনেক স্থানে মসজিদকে কেন্দ্র করে হামলা চালানো হয়। স্কাই নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে দুই মুসলিম নারী লিভারপুলে অবস্থিত আব্দুল্লাহ কুয়াইলিয়াম মসজিদে দাঙ্গাকারীদের হামলার আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন। মুসলিম উইমেনস নেটওয়ার্কের

প্রধান নির্বাহী ব্যারোনেস শাইস্তা যহীর স্কাই নিউজকে বলেন, গত এক দশক ধরে মুসল্লিদের ওপর বিদ্বেষ বেড়েছে।

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল পুলিশ চিফস কাউন্সিল জানিয়েছে, কয়েকদিন ধরে চলা দাঙ্গায় সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার পাশাপাশি মুসলিম ও অভিবাসীদের লক্ষ্য করে বর্ণবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে, এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত হাজারেও বেশি দাঙ্গাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যে তারা জানায়, পুরো যুক্তরাজ্যজুড়ে ১০২৪ জনকে গ্রেফতার করে এদের মধ্যে ৫৭৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৬৯ বছর বয়সী বৃদ্ধ থেকে শুরু করে ১১ বছরের বালক পর্যন্ত আছে। ভাঙচুরের অভিযোগে ওই বৃদ্ধকে লিভারপুল থেকে এবং শিশুটিকে বেলফাস্ট থেকে আটক করা হয়।

রাশিয়ায় অমুসলিমদের অপতৎপরতা

রাশিয়ায় অমুসলিমদের অপতৎপরতা বিষয়ে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ বা আলোচনা শোনা যায়, তবে এ ধরনের বিষয়গুলির সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য এবং বিশ্লেষণ প্রদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায় একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্দোলন রয়েছে যা সমাজে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করে। রাশিয়ার সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বহু ধর্মের সহাবস্থানকে সমর্থন করে, তবে কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য বা অবিচার হতে দেখা গেছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু সদস্যরা বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হন, যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতা, মসজিদ নির্মাণ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন নিয়ে কিছু স্থানীয় চ্যালেঞ্জ।

রাশিয়ার সরকার সাধারণত সন্ত্রাসবাদ দমন এবং নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে এসব অভিযান চালানোর দাবি করে। তবে মানবাধিকার সংস্থাগুলি মনে করে যে, এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। চেচনিয়া রুশ ফেডারেশনের অন্তর্গত একটি মুসলিম স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। চেচনিয়া রাশিয়ার উত্তর ককেসাস অঞ্চলে অবস্থিত। চেচনিয়ার আয়তন ১ লাখ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১৪ লাখ। চেচনিয়ার অধিকাংশ জনগণ মুসলিম। চেচনিয়া বহু বছর ধরে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে আসছে এবং তাদের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসনের ইতিহাস প্রায় ৪০০ বছরের।

পিটার দি গ্রেট থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সব শাসকই চেচনিয়ার স্বাধীনতার দাবিকে অগ্রাহ্য করে এসেছে।

মুসলিম গণহত্যার ষড়যন্ত্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ মানুষদের সেনাবাহিনীতে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করছিল। কিন্তু চেচেন-ইঙ্গুশরা এটার ব্যাপকভাবে বিরোধিতা করেছিল। ১৯৪২ সালে শীতকালে যখন কর্তৃপক্ষ জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে ঢুকাচ্ছিল, তখন পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে সক্ষম ১৪ হাজার চেচেনের মধ্যে মাত্র ৪ হাজার ৩৯৫ জনকে লিস্ট করা সম্ভব হয়েছিল, আর ২ হাজার ৩৬৫ জন পালিয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত সরকার এ সময় অনেক চেষ্টা করে ১৭ হাজার ৫০০ জন চেচেনকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিল, যার অনেকে পালিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে রেড আর্মি থেকে পালিয়ে যাওয়া চেচেন ও ইঙ্গুশদের সংখ্যা ৫০ হাজারে পৌঁছেছিল এবং ১৪ হাজার জন পাহাড়ে পলায়নরত ছিলেন।
এরপরও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৪০ হাজার চেচেন ও ইঙ্গুশ মানুষ সোভিয়েতের রেড আর্মির পক্ষে যুদ্ধ করেছিল, তন্মধ্যে ৫০ জনকে 'হিরো অব সোভিয়েত' ঘোষণা করা হয়েছিল; কিন্তু এরপরও সোভিয়েত সরকার চেচেনদের জার্মানি নাজি বাহিনীর সঙ্গে সহায়তা করার দায়ে অভিযুক্ত করেছিল। কেননা নাজি বাহিনী ১৯৪২-৪৩ সালে শীতকালে চেচনিয়া-ইঙ্গুস্তিয়ার পশ্চিমাংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। এমন ষড়যন্ত্রমূলক দাবিও করা হয়েছিল, চেচেনরা নাকি নাজি বাহিনীকে আজারবাইজানের পাহাড় দেখিয়ে দিয়েছিল, যা কি-না তেলক্ষেত্র ছিল। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীতে যোগ দেওয়া চেচেনদের সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল। চেচেন ও ইঙ্গুশ লোকজন নিজেরাই স্বাধীনতার দাবি করছিল সোভিয়েতের বিরুদ্ধে। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের পক্ষে অনেক চেচেন-ইঙ্গুশ রেড আর্মিতে যুদ্ধ করলেও সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সোভিয়েত সরকার চেচেন ও ইঙ্গুশদের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। তারই ফলশ্রুতিতে চেচেন ও ইঙ্গুশ মুসলমানদের গণহত্যার পরিকল্পনা করে তারা।

অপারেশন লেন্টিল

১৯৪৩ সালের ১৩ অক্টোবর ১ লাখ ২০ হাজার মুসলমানকে চেচনিয়া-ইঙ্গুশতিয়াতে ব্রিজ সংস্কারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর ১৯৪৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি 'রেড আর্মি দিবস'-এ জোসেফ স্টালিনের অনুমতিক্রমে ল্যাভরেনটাই বেরিয়া তাদের সবাইকে পার্টি বিল্ডিংয়ে ডেকে আনল এবং তাদের জানিয়ে দেওয়া হলো যে, জার্মানিদেরকে সহায়তার অভিযোগে শাস্তিস্বরূপ তাদের সবাইকে নির্বাসিত করা হলো। সমগ্র জাতি থেকে ৫ লাখ মানুষকে সাইবেরিয়া, কাজাখস্তান ও কিরগিস্তানে নির্বাসিত করা হয়েছিল। নির্বাসিত এসব জনগণের

মধ্যে ৪০-৫০ ভাগ ছিল শিশু। নির্বাসিত করার আগেই অনেককে শহীদ করা হয়েছিল, অনেককে নির্বাসন যাত্রায় শহীদ করা হয়েছিল, পরেও শহীদ করা হয়েছিল; কিন্তু সেগুলো হিসাবে আসেনি। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত নির্বাসিত এসব মুসলমান চেচনিয়ায় ফিরে যেতে পারেননি। এই অপারেশনকে অপারেশন লেন্টিল বলা হয়।

খাইবাখ মুসলিম গণহত্যা

নির্বাসিত মুসলমানদের তাপ নিরোধক কোনো ব্যবস্থা ছাড়াই গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফলে প্রতিকূল আবহাওয়ায় অনেকেই যাত্রাপথেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু ভয়াবহ ও পাশবিক এক ঘটনা ঘটে গেল খাইবাখ নামক অঞ্চলের কাছে। পথিমধ্যে প্রায় ৭০০ জন নারী, শিশুসহ মুসলমান গ্রামবাসীকে সোভিয়েত কাফেররা তালাবদ্ধ করে দিয়ে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফলে সবাই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে শাহাদতবরণ করেন। এমনকি যারা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, তাদেরও গুলি করে শহীদ করা হয়েছিল। এমন ন্যক্কারজনক কাজের জন্য 'গেভেসিয়ানি'কে 'ল্যাভরেন্টি বেরিয়া' তাকে অভ্যর্থনা জানায় (নাউযুবিল্লাহ)।
পরবর্তী গ্রীষ্মকালে চেচনিয়ার অনেক অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে রাশিয়ান নাম দেওয়া হয়। মসজিদ ও মাজার শরিফ ভেঙে ফেলা হয়। চেচেন মুসলমানদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক কিতাবাদি পুড়ে ফেলা হয়। চেচেন মুসলমানদের নাম-নিশানা এ সময় ইতিহাস ও এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে মুছে ফেলা হয়। পরবর্তীকালে ইতিহাসবিদরা খাইবাখ গণহত্যার নমুনা পুনরুদ্ধার করেন।

নির্বাসন মুক্তি

নির্বাসিত জীবনে মুসলমানেরা চরম কষ্টে দিনাতিপাত করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয় সার্বক্ষণিক তাদের যাতনা দিত। মুসলমানদের নির্বাসনে দেওয়ার এ সুযোগে চেচেন লাইব্রেরিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চেচনিয়ার মুসলিম জনপদকে গ্রোজনি অবলাস্টে রূপান্তরিত করা হলো এবং অনেক জমি বিভিন্ন রাজ্যের অংশ করে দেওয়া হল। এমনকি মুসলিম জনপদে শূন্য পড়ে থাকা বাড়িগুলোতে বিশ্বযুদ্ধে বাস্তুহারাদের থাকার ব্যবস্থা কর হলো। পরিত্যক্ত বাড়িগুলোতে শুধু ইহুদি ও মেসখেতিয়ান তুর্কিদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এভাবেই চেচনিয়ার মুসলিম জনপদ থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার হীন ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল স্টালিন। অবশেষে ১৯৫৩ সালে জালিম স্টালিনের মৃত্যু হলে ১৯৫৭ সালে সোভিয়েতের তৎকালীন সরকার এ অধ্যাদেশ জারি করল যে, নির্বাসিত মুলমানরা সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কোনো প্রান্তে পুনরায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবে। কিন্তু মুসলমানেরা তাদের আবাসভূমিতে ফিরে এলেও কাফেররা আবারও নানা ছুতায় দাঙ্গা শুরু করে। ১৯৫৮ সালে এমনি এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চেচেনিয়া ভাষার কোনো স্কুল করতে দেওয়া হয়নি, যাতে মুসলমানরা জ্ঞানের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে।

বর্তমান অবস্থা

১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে দীর্ঘকালের রুশ দুঃশাসনের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রত্যাশায় স্বাধীনচেতা চেচেনরা **১৯৯১** সালের সেপ্টেম্বরে গণভোটের আয়োজন করে। গণভোটে চেচনিয়ার অধিকাংশ জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু তৎকালীন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিন চেচনিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং চেচনিয়ায় প্রেসিডেন্টের শাসন জারি করে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু চেচেন স্বাধীনতাকামীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে আগ্রাসী রুশ বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। **১৯৯১** সালের ২৯ অক্টোবর চেচনিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে সোভিয়েত বাহিনীর সাবেক জেনারেল জওহর দুদায়েভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তিনি ২৪ নভেম্বর **১৯৯১** আনুষ্ঠানিকভাবে চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দুদায়েভের এ পদক্ষেপ রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠী মেনে নিতে পারেনি।

জার্মানে অমুসলিমদের অপতৎপরতা

জার্মানিতে মুসলিমদের উপর নির্যাতন বা বৈষম্য নিয়ে আলোচনা অনেক জটিল এবং বহুমুখী। যদিও জার্মানির আইন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কঠোর এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষা করে, তবুও কিছু অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্য এবং নিপীড়নের ঘটনা ঘটে।যেমন;

1. **ইসলামোফোবিয়া:** জার্মানিতে প্রকাশ্যে অ্যান্টিসেমেটিক অনুভূতি ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ। সেই ঘৃণা এখন প্রকাশিত হয় ইসলামোফোবিয়ার মাধ্যমে।মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বা ইসলামোফোবিয়া অনেক পশ্চিমা দেশে, যেমন জার্মানিতে, এক সময় বাড়ছে। এতে মুসলিমরা শারীরিক, মানসিক, এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।
2. **রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে বৈষম্য**: জার্মানিতে অভিবাসী ও মুসলিমদের নিয়ে এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব অনেকেই পোষণ করেন, যা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল ও নেতাদের বক্তব্যে প্রতিফলিত হতে পারে। ইসলামিক পোশাক, বিশেষ করে হিজাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতা আনার বিষয়ে আইন প্রণয়নের কথাও বহুবার উঠে এসেছে।

3. **মসজিদ ও ধর্মীয় স্থানের উপর আক্রমণ:** মুসলিমদের ধর্মীয় স্থান, যেমন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারগুলো মাঝে মাঝে হামলার শিকার হয়েছে। অনেক সময় ঘৃণামূলক বার্তা ও ভাঙচুরের মতো ঘটনারও রিপোর্ট পাওয়া গেছে।
4. **শরণার্থী সংকট:** ২০১৫ সালে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা থেকে লাখ লাখ শরণার্থী জার্মানিতে আশ্রয় নেন। তাদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম ছিলেন, যা মুসলিম বিরোধী অনুভূতিকে উস্কে দিয়েছে।
5. **জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী:** কিছু জাত্যবাদী গোষ্ঠী মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়, যার মধ্যে রয়েছে শারীরিক হামলা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর আক্রমণ এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক কাজ।
6. **বৈষম্য ও সংখ্যালঘু অধিকার:** মুসলিমরা অনেক ক্ষেত্রে চাকরিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সমাজে বৈষম্য বা অসুবিধার সম্মুখীন হন।

জার্মানিতে ক্ষমতাসীন জোটের সদস্যরা বারবার জার্মানিতে 'ইসলামবাদের' নিন্দা করেছে। বুন্ডেস্ট্যাগে গ্রিন পার্টির নেতা ক্যাথারিনা ড্রোজ সাম্প্রতিক বিবৃতিতে এই দাবিও করেছেন যে 'ইসলামের বিষ শুধু বিদেশে নয়, এখানেও মানুষের মনে পৌঁছেছে'। পরে অবশ্য তিনি শুধরে নিয়ে বলেছেন যে তিনি 'ইসলাম' নয়, 'ইসলামবাদ' বলতে চেয়েছিলেন।

'ইসলামবাদী হুমকি' সম্পর্কে সতর্কীকরণের শব্দগুলো কেবল জার্মান রাজনীতিবিদদের মুখেই সীমাবদ্ধ, এমন নয়। সেগুলো এখন জার্মান প্রতিষ্ঠানের সব দাপ্তরিক নথি এবং নীতিমালার ঘোষণাগুলোতেও ঠাঁই নিয়েছে। প্রধান জার্মান গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল অফিস ফর দ্য প্রোটেকশন অব দ্য কনস্টিটিউশনের ওয়েবসাইটে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, 'ইসলামবাদীরা তাদের ধর্মকে কাজে লাগিয়ে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির মুক্ত গণতান্ত্রিক মৌলিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাতিল করার লক্ষ্যে কাজ করছে।'

জার্মানিতে অতিডানপন্থী শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, একটি বর্ণবাদী হিস্টিরিয়া জার্মান রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে একটি গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে। ইহুদিদের ইতিহাসের মতো এর সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি না–ও হতে পারে। পাল্টা-অভিবাসনের অতিডান ধারণাটি দ্রুত ভিত্তি লাভ করছে। গণহত্যার বদলে হয়তো গণবহিষ্কার। এই দাবি এখন মূলধারায় পরিণত হওয়ার শঙ্কা আছে। তবে সবার মনে রাখা উচিত তাদের পূর্বজরা প্রায় এক শতাব্দী আগে এমন কাজই করেছিল। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, ঘৃণা কোনো ভালো কৌশল নয়।

জার্মান সরকার এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা মুসলিম সম্প্রদায়ের সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তবে এই ধরনের বৈষম্য এবং নির্যাতন নির্মূল করার জন্য এখনো অনেক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

মায়ানমারে অমুসলিমদের অপতৎপরতা

মায়ানমারে সাম্প্রদায়িক হিংসা অব্যাহত। হিংসার থামার কোনও লক্ষণ নেই। বরং তা বেড়েই চলছে ক্রমাগত।হিংসার আগুনে পুড়ছে মায়ানমার। দিন দিন বাড়ছে বিদ্রোহের আগুনের উত্তাপ। মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে রাখাইন রাজ্যে একাধিক বিদ্রোহী গোষ্ঠী। রাখাইন রাজ্যের বিভিন্ন অংশে জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান লড়াইয়ে ফলে মায়ানমারে উত্তপ্ত পরিস্থিতি কমার লক্ষণও নেই বরং তা বাড়ছে।

মায়ানমারে অমুসলিমদের প্রতি সহিংসতা এবং অত্যাচারের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে, বিশেষ করে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে। তবে, শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায় নয়, অন্যান্য অমুসলিম জনগণও সহিংসতা এবং বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

মায়ানমারে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপতৎপরতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি বেশ কয়েকটি প্রধান বিষয়ে ভাগ করা যায়:

1. **রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার**: রোহিঙ্গা জনগণ, যাদের অধিকাংশ মুসলিম, মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে বসবাস করে। তারা দীর্ঘকাল ধরে নাগরিকত্ব ও মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। মিয়ানমার সরকার তাদের 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে বিবেচনা করে, যদিও তারা শত শত বছর ধরে ওই এলাকায় বাস করছে। ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দমন-পীড়ন শুরু করে, যার ফলে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে যায় এবং হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়।
2. **খ্রিস্টান সম্প্রদায়**: মিয়ানমারে খ্রিস্টানরা বিশেষভাবে চীন সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে বসবাস করে, তবে এই সম্প্রদায়ও সরকারী অত্যাচার এবং সহিংসতার শিকার হয়েছে। তাদের মন্দির ও ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে, এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে।
3. **হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণ**: মিয়ানমারে ছোট একটি হিন্দু সম্প্রদায়ও রয়েছে, যারা একসময় রোহিঙ্গাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। তবে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা সংকটের সময়, কিছু হিন্দু জনগণও সহিংসতা এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছিল।
4. **সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ**: মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী সরকারী বাহিনী ও মুসলিম জনগণের মধ্যে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সংঘটিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠী কিছু অঞ্চলে ইসলামিক সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চালানোর অভিযোগ করেছে।

এই সমস্ত ঘটনাগুলি একটি বৃহৎ সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যার ফলে মিয়ানমারে অমুসলিমদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সহিংসতার ঘটনা বাড়ছে। এসব সহিংসতা এবং বৈষম্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু মিয়ানমারের সরকার অনেক সময় এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করে।

অমুসলিমদের ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশ নিম্নরূপ

অমুসলিমরা একই শ্রেণিভুক্ত নয়। এ ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশ নিম্নরূপ,
"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে তোমাদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। তাঁরা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না। (মায়িদাহঃ ৫১)

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তাঁরা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসুলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক (তাহলে তাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না)। তোমরা গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেউ এটা করে, সে ত সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়।" (মুমতাহিনাহঃ ১)

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতৃগন যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফুরকে পছন্দ করে, তাহলে তাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা যাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে তাঁরাই হবে অত্যাচারী।" (তাওবাহঃ২৩)

"তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, জারা ভালবাসে আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচারিকে। হক না এই বিরুদ্ধা চারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ইমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী

করেছেন তার পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, আল্লাহ তাদের অতি প্রসন্ন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। (মুজাদালাহঃ ২২)

“দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্করণে সহযোগিতা করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তাঁরাইতো অত্যাচারী।” (মুমতাহিনাহঃ ৮-৯)

অমুসলিমদের সাথে আচরণে ইসলামের নির্দেশনা

সাহাবী হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি আমরাও দাঁড়ালাম। আমরা তাঁকে বললাম, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো এক ইহুদির লাশ!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যখন কোনো লাশ নিতে দেখবে, তখন দাঁড়াবে।’ -সহীহ বুখারী, হাদীস: (১৩১১)

অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করার জন্যে ইসলাম যে উদার নির্দেশনা দেয়, উপরোক্ত হাদীসটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির নানা পেশার নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। লেনদেন ওঠাবসা চলাফেরা সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে একজন মুসলমান ও একজন অমুসলমানের সাক্ষাৎ হতে পারে। কোনো মুসলিমপ্রধান দেশে অমুসলিমদের বসবাস কিংবা কোনো অমুসলিমপ্রধান দেশে মুসলমানদের বসবাস এখন বিচিত্র কিছু নয়। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। কোনো অমুসলিম যদি

পুরনো ধর্ম ছেড়ে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তাহলে তো আরও অনেক অমুসলিমের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও থাকবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যেভাবে দলে দলে অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আসছে, তাতে এ বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক।

ইসলামে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধানও দেয়া হয়েছে- এ কথা ঠিক, তবে এও অনস্বীকার্য যে, যুদ্ধের ময়দানের বাইরে তাদের নিরাপত্তাদান, তাদের সাথে সৌজন্য বজায় রেখে উত্তম আচরণের কথাও বলা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধের মাঠেও যেন অমানবিক আচরণ করা না হয়, যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদেরকে, বিশেষত নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর যেন হামলা করা না হয়- এ আদেশও দেয়া হয়েছে।

যদি কারও কোনো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হল- তার সাথেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের হক রক্ষা করে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ দুটি সম্পর্ক রক্ষা করার ওপর যথেষ্ট জোর দেয়া হয়েছে।

সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, একজন প্রতিবেশীর ওপর আরেকজন প্রতিবেশীর কী হক রয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন,

إِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ وَإِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ وَإِنِ احْتَاجَ أَعْطَيْتَهُ وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّيْتَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعَتَ جَنَازَتَهُ وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُؤْذِيهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ

অর্থঃ‘যদি সে তোমার কাছে ঋণ চায় তাহলে ঋণ দেবে, যদি তোমার সহযোগিতা চায় তাহলে তাকে সহযোগিতা করবে, যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার খোঁজখবর নেবে, তার কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে তাকে তা দেবে, সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার খোঁজখবর নেবে, যখন সে ভালো কিছু লাভ করবে তখন তাকে শুভেচ্ছা জানাবে, যদি সে বিপদে পড়ে তাহলে সান্ত্বনা দেবে, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরিক হবে, তার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘর এত উঁচু করবে না যে তার ঘরে বাতাস ঢুকতে পারে না, কোনো ভালো খাবার রান্না করলে তাকে এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে কষ্ট দেবে না, তবে যদি তার ঘরেও সে খাবার থেকে কিছু পৌঁছে দাও। যখন কোনো ফল কিনে তোমার বাড়িতে নেবে তখন হাদিয়াস্বরূপ তাকে সেখান থেকে কিছু দেবে। [খারায়েতী, তবারানী, আবুশ শায়খ- ফাতহুল বারীখ. ১০, পৃ. ৫১৯, কিতাবুল আদব, বাব-৩১]

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার বিষয়ে নির্দেশনা তো আরও স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। -সহীহ বুখারী, হাদীর: ৬১৩৮

প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার এই যে নির্দেশনা, তাতে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এমনটি বলা হয়নি- তোমার প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয় যদি মুসলমান হয়, ধার্মিক হয়, ভালো মানুষ হয়, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। বরং প্রতিবেশী ও আত্মীয় যেমনই হোক, মুসলমান হোক কিংবা না হোক, তার অধিকার অকাট্য ও অনস্বীকার্য। একজন মুসলমানকে এ অধিকার রক্ষা করেই জীবনযাপন করতে হবে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিছু নির্দেশনা এমনও রয়েছে, যেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। যেমন, সূরা আনকাবুতের ভাষ্য-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

আমি মানুষকে বাবা-মায়ের সাথে সুন্দর আচরণের আদেশ করেছি। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সঙ্গে এমন কিছু শরিক করতে, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তাদের কথা মানবে না। -সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৮

সূরা লুকমানে একই প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে,

"وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ."

অর্থঃ "তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচরণ কর। এমন ব্যক্তির পথ অবলম্বন কর, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। অতপর তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা যা-কিছু করতে"। -লুকমান, আয়াত: ১৫

কুরআনে কারীমের উক্ত আয়াত দুটি থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, যদি কোনো মুশরিক বাবা-মা তাদের মুসলিম কোনো সমন্তানকে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করতে বলে, তাহলে তাদের এ আদেশ কখনো মানা যাবে না। কিন্তু এমতাবস্থায়ও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। বাবা-মায়ের হক আদায় করতে হবে।

প্রতিবেশীর অধিকার সম্বলিত যেসকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেসবে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি- সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর ঘটনা। একদিন তার ঘরে একটি বকরি জবাই

করা হল। খাবার রান্না হলে তিনি তার গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে কি এ খাবার দিয়েছ?' এরপর তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, প্রতিবেশীর বিষয়ে জিবরাইল আমাকে এত উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমি মনে করছিলাম, তিনি হয়ত তাদেরকে ওয়ারিশই বানিয়ে দেবেন।' -জামে তিরমিযী, হাদীস: ১৯৪৩

ইসলামী রাষ্ট্রে যে সকল অমুসলিম রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন মেনে বসবাস করবে, তারা সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ জীবন যাপন করবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তারা তাদের নির্ধারিত সকল হক পাবে। সন্দেহ নেই, রাষ্ট্রের শান্তিশৃংখলা বজায় রাখার জন্যে এ বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হযরত উমর রা.-এর একটি ঘটনা। তিনি তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। একদিন এক ইহুদি বৃদ্ধকে দেখলেন মসজিদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে। তখন তিনি ইহুদিকে লক্ষ করে বললেন,

مَا أَنْصَفْنَاكَ إِنْ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْيَةَ فِي شَبِيبَتِكَ، ثُمَّ ضَيَّعْنَاكَ فِي كِبَرِكَ .قَالَ :ثُمَّ أَجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْلِحُهُ

অর্থঃআমরা তোমার ওপর ইনসাফ করতে পারিনি যদি তোমার যৌবনে আমরা তোমার নিকট থেকে জিযয়া গ্রহণ করে থাকি আর তোমার বার্ধক্যে তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেই। এরপর তিনি তার জন্যে বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। -কিতাবুল আমওয়াল, ইবনে যানজূয়াহ্, ১/১৪৩, হাদীস ১৭৯

হযরত উমর রা. বৃদ্ধ ইহুদির জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন- এটা তো তিনি শাসক হিসেবে করতেই পারেন। কিন্তু তিনি সেই ইহুদিকে লক্ষ করে যে কথাটি বললেন, তা আমাদের সামনে চিন্তার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে। যে সহানুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন এটাই ইসলামের সৌন্দর্য ও আসল চরিত্র।

অমুসলিমদের সাথে সুন্দর ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ রক্ষার শিক্ষাপ্রদানের পাশাপাশি ইসলাম তাকিদের সাথে বারবার এ নির্দেশও দিয়েছে- 'কোনো মুসলমান যেন কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।' এবং এ তাকিদও করেছে, সৌজন্য ও উদারতার নামে যেন নিজেদের দ্বীনদারি আক্রান্ত না হয়। দ্বীনের বিষয়ে আপোস করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়। এমনিভাবে সদাচরণের ক্ষেত্রে কোনো অমুসলিমকে মুসলিম ভাই থেকে প্রাধান্য দেওয়াও বৈধ নয়।

অমুসলিমদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সূরা মুমতাহিনার এই নির্দেশনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য-

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরম্নদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদের তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা জালিম। -সূরা মুমতাহিনা :(৮-৯)

শরীয়তের সীমারেখায় থেকে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে যেমন অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তেমনি এ আচরণটুকুও অনেক সময় দাওয়াতের ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন মহানুভব আচরণে মুগ্ধ হয়েও তো অনেকেই ইসলাম কবুল করেছেন এবং পরবর্তীতেও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে যারাই ইসলামের সুন্দর আচারগুলো নিজেদের মাঝে লালন করে গেছেন, তাদের আচরণই নীরবে অমুসলমানদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছে। অনেক অমুসলিম এতে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে এবং আশ্রয় নিয়েছে ইসলামের শীতল ছায়ায়।

অমুসলিমদের অপতৎপরতা প্রতিরোধে আমাদের করণীয়ঃ

নিশ্চয় এ দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বড় আর তা সকল মুসলিমের উপর সমভাব আবর্তিত; এককভাবে হোক কিংবা সংঘবদ্ধভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক কিংবা গোষ্ঠীগতভাবে হোক। তাদের সবার উপরই এ দায়িত্ব আপতিত। কেননা প্রতিটি মুসলিম ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই তাদের এ বিষাক্ত টার্গেটের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

এ পরিস্থিতিতে আমাদের যা করণীয় বা বাস্তবতার ভিত্তিতে যে উপযোগী কৌশল ও শরঈ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

(১) সকল মুসলিম, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সন্তানদের অন্তরে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মৌলিকভাবে গেঁথে দেওয়া। আর তা করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকল প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাগারে সরকারী ও জাতীয় ভিত্তিতে।

(২) মুসলিম জাতির সর্বস্তরে দীনের বাস্তব জ্ঞানের সম্প্রচার এবং হৃদয়ে দীনী আত্মমর্যাদা, পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধ পুরোপুরি জাগ্রত করা।

(৩) খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের যাবতীয় উপকরণ: ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা-প্রচারণা ইত্যাদির প্রবেশ পথ চিহ্নিত করতঃ এগুলোর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং এর অবাধ্যতায় দমনমূলক শাস্তিবিধান করা।

(৪) জনসাধারণকে তাদের পাতানো ফাঁদ থেকে বাঁচানো ও সাবধান করার জন্য খ্রিস্টানদের মিশনের ভয়াবহতা, অপকৌশল ও পন্থাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(৫) মুসলিমের জীবনের সকল মৌলিক দিকগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত দিক ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে যত্নবান থাকা, কেননা বাস্তবে যা ঘটছে তা হলো খ্রিস্টানরা এ দুটি মারাত্মক পথেই মানুষের অন্তরে ও মগজে ঢুকে পড়েছে।

(৬) প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ, সে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো পরিস্থিতির শিকার হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দীন ও আকীদাকে মজবুতভাবে ধারণ করা এবং সে ব্যক্তিগত ও তার অধীনস্থদের জীবনে ইসলামী নিয়ম-নীতি ও নির্দেশাবলীকে যতদূর সম্ভব সু-প্রতিষ্ঠিত করা, যার ফলে তার বাড়ীর প্রতিটি সদস্য যেন ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত ঈমান, আকীদা ও চরিত্র বিনষ্টকারী সংগ্রামের মুকাবিলায় সুরক্ষিত থাকতে পারে।

(৭) বিশেষ জরুরি প্রয়োজন, যেমন চিকিৎসা বা এমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা যা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে অবর্তমান, এমন উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ও পরিবারের কাফির রাষ্ট্রে ভ্রমণ করা থেকে সাবধান থাকা। আর উক্ত প্রয়োজনে যদি ভ্রমণ করতে হয় তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধর্মীয় ফিতনা ও সংশয় প্রতিহত করার প্রস্তুতি সাথে থাকতে হবে।

(৮) মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে; যার ফলে মানবাধিকার রক্ষিত হবে এবং মুসলিমদের যাবতীয় অভাব দূরীকরণে সমবায়ভিত্তিক জনকল্যাণমুখী দাতব্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে, এর ফলে তাদের অভাব ও দারিদ্র বিমোচনের নামে খ্রিস্টানদের কালো থাবা তাদের ওপর প্রসারিত হবে না।

মুসলমানদের উপর অত্যাচার এবং নির্যাতনের প্রতিরোধে মুসলমানদের করনীয়ঃ

বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র মুসলমান জনগণ এক মহাসংকটকাল অতিক্রম করছে। যে সব দেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সেসব দেশের কোন কোনটিতে মুসলমান শুধু নিপীড়িত ও নির্যাতিত হচ্ছে শুধু তাই নয় বরং তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, দেশ হতে বিতাড়িত করা হচ্ছে। তথাকথিত অহিংসবাদীদের হিংসাত্মক ও হিংস্র আক্রমণে মানবতা যখন বিপর্যস্ত তখন বিশ্বমানবতাবাদীদের নিরব ভূমিকা শত প্রশ্নের জন্ম দেয় বৈ কি।

মুসলিম জাতির বর্তমান কালের সংকটময় এই পরিস্থিতি ঈমানী ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অধিকারী, দৃঢ় ঈমানী চেতনার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের জন্যই শুধু নয় বরং সামান্য ঈমানী চেতনার অধিকারী সাধারণ মুসলিম জনগণের জন্যও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী। এহেন পরিস্থিতি অবলোকন করে সাধারণ মুসলমান তো বটেই বহু দ্বীনদার ও দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী শ্রেণীও হতাশার শিকার হচ্ছে।কিন্তু মুসলমানমাত্রই যে বিশ্বাস অন্তরে লালন করে থাকে সেই বিশ্বাসকে সদাসর্বদা অন্তরে জাগরুক রাখা উচিৎ, সর্বদা স্মরণে রাখা উচিৎ। আর তা হল, আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মহাবিশ্বের পরিচালনার লাগাম তাঁর হাতে, তিনি তাঁর দ্বীনের সংরক্ষক, সত্য সমুন্নতকারী, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের সাহায্যকারী, বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত মানুষের ত্রাতা, স্বৈরাচারী ও দাম্ভিকের আস্ফালন ও দম্ভ চূর্ণকারী। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল-ألا له الخلق(জেনে রেখো, সকল মাখলুকই তাঁর কর্তৃত্বাধীন এবং তাঁর নির্দেশই কার্যকর। আরাফ ৭ : ৫৪)

তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ “বল হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যান তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান”। (আলে ইমরান, আয়াত ২৬)

এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মহামহিম আল্লাহ রাববুল আলামীনের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন অসম্ভব কিছু নয়।

মুসলমানদের উপর অমুসলিমদের অত্যাচার এবং নির্যাতন কোনো নতুন বিষয় নয়। ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সম্প্রদায় নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। তবে এই সমস্যার প্রতিরোধ ও সমাধানে ইসলামিক শিক্ষার আলোকে মুসলমানদের কিছু করণীয় রয়েছে। নিচে তা তুলে ধরা হলোঃ

১. আল্লহর উপর দৃঢ় ঈমান রাখা

- যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপর ভরসা রাখা অত্যন্ত জরুরি। কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর সাহায্য কামনা এবং ধৈর্য ধারণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
- কুরআন এ মহান আল্লহ তা'আলা বলেনঃ

"তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল-ইমরান: ২০০)

২. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

- মুসলিম উম্মাহকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা ও সচেতনতা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়ক।
- ইসলামে শিক্ষা অর্জনকে ফরজ করা হয়েছে, যা মুসলমানদের নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে।

৩. একতা ও ঐক্য বজায় রাখা

- মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি অত্যাচারকারীদের শক্তি বাড়িয়ে তোলে। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা এবং একে অপরকে সহায়তা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- হাদিসে বলা হয়েছে: **"মুসলমানরা এক দেহের মতো, যদি তার একটি অঙ্গ কষ্ট পায়, তাহলে পুরো দেহ সেই কষ্ট অনুভব করে।"** (বুখারি ও মুসলিম)

৪. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

- অত্যাচারের মোকাবিলায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। নিজে ন্যায়ের পথে থেকে অন্যায়কারীদের প্রতিরোধ করতে হবে।
- কুরআনে বলা হয়েছে: **"তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, যদিও তা তোমাদের নিজের বিপক্ষেই যায়।"** (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)

৫. দুর্বলদের সহায়তা করা

- অত্যাচারিত ও নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়ানো ইসলামিক দায়িত্ব। তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৬. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

- মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে সচেতন করা প্রয়োজন।

৭. আত্মরক্ষা ও প্রস্তুতি

- যদি কোনো নির্যাতন ফিজিক্যাল বা যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যায়, তবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া শরীয়তসম্মত। তবে এটি ন্যায়সঙ্গত পন্থায় করতে হবে।
- আল্লাহ তাআলা আল কুরআন এ বলেন:

"তোমরা নিজেরা শক্তি অর্জন করো এবং আল্লাহর পথে প্রস্তুত থাকো।" (সূরা আনফাল: ৬০)

৮. দোয়া ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা

- অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে এবং সমাধানের জন্য দোয়া একটি শক্তিশালী অস্ত্র।

৯. অন্যায়ের প্রতিবাদে সংগঠিত হওয়া

- শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ করা এবং অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা প্রয়োজন। এতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন পাওয়া সহজ হয়।

১০. কৌশলগত পরিকল্পনা

- অত্যাচার ও নির্যাতন বন্ধ করতে ধৈর্যের সাথে কৌশল প্রণয়ন করে কাজ করতে হবে। হুটহাট সিদ্ধান্ত বা প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে তাঁর সুন্দর-সুন্দর নাম ও উচ্চ গুণাবলীর উসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিমদের বিক্ষিপ্ততাকে একত্রিত করে দেন, তাদের পরস্পরের আন্তরিকতাকে সুদৃঢ় করেন, তাদেরকে সংশোধন করেন এবং প্রশান্তির পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন, পক্ষান্তরে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রদান করেন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। নিশ্চয় তিনি অতিশয় দয়াবান।
“হে আল্লাহ! যে কেউ ইসলাম ও মুসলিমদের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা পোষণ করে তাকে তার নিজের ব্যাপারে ব্যস্ত রাখো, তার ষড়যন্ত্র তার ঘাড়ে ফিরিয়ে দাও এবং তার সকল অনিষ্ট পোষণের গন্ডি তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ, নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান”।

রেফারেন্স

১)https://thegreatestnation.wordpress.com/2018/11/21/%E0%A6%AC%E0%
A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A
6%B6%E0%A7%87-
%E0%A6%96%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%
E0%A6%A8-
%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0/
২)https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%
E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%
E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%
E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E
0%A7%87_%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B8%E
0%A6%A4%E0%A6%BE
৩)https://www.bbc.com/bengali/articles/cw8qn854w9lo
৪)https://en-m-wikipedia-
org.translate.goog/wiki/Violence_against_Muslims_in_independent_India?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=tc
৫)https://www.bbc.com/bengali/articles/c874peyrl68o
৬)https://www.bbc.com/bengali/news-63304400.amp
৭)https://en-m-wikipedia-
org.translate.goog/wiki/French_ban_on_face_covering?_x_tr_sl=en&_x_tr_
tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=tc
৮)https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-
life/2018/07/27/662484
৯)https://sharebiz.net/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7
%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-
%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6
%AE-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6
%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0/

১০)https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Forced_conversions_of_Muslims_in_Spain?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=tc
১১)https://eisamay.com/world/nearly-five-thousand-houses-of-buddhists-hindus-gutted-in-myanmar-as-tensions-simmer/articleshow/110295345.cms
১২)https://www.alkawsar.com/bn/article/1246/
১৩)https://www.kalerkantho.com/online/muslim-world/2021/10/18/1084341